যে তরণীখানি

কৃষ্ণা বসু

যে তরণীখানি • কৃষ্ণা বসু

8 197877 561825

যে তরণীখানি
একটি স্মৃতিকথা



নেতাজি ভবনে, নেতাজির শোবার ঘরের সামনে শিশিরকুমার ও কৃষ্ণা বসু

যে তরণীখানি

একটি স্মৃতিকথা

কৃষ্ণা বসু

আনন্দ

তরণীতে সহযাত্রী
সুগত, শর্মিলা ও সুমন্ত্রর জন্য

প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০১

© কৃষ্ণা বসু

ISBN 81-7756-182-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৫০.০০

নিবেদন

এক গভীর ব্যক্তিগত শোকের সময়ে এই লেখাটি লিখেছিলাম। শিশিরকুমার বসুর আকস্মিক প্রয়াণের আঘাত তখনও বড় তীব্র। পিছন ফিরে ভেবে একটু আশ্চর্য লাগে যে পুরো লেখাটাই আকাশপথে লেখা। নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের কাজে ডুবে থাকলে শোক ভুলে থাকা সম্ভব হতে পারে মনে করে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম। কাজের মধ্যে ডুবে ছিলাম ঠিকই, দেশ বিদেশের মানুষের ভিড়, নানান কমিটির কাজে ভাগ নিচ্ছি, সিকিওরিটি কাউনসিলে বক্তৃতা করছি, কিন্তু অন্তরের গভীরে কোথাও রক্তপাত হয়ে চলেছে। উপলব্ধি করলাম শোক ভুলে থাকা অত সহজ নয়। ফিরতি পথে বস্টনে প্লেনে উঠে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। লেখাটা যেন চোখের জলের মতো ঝরঝর করে ঝরে পড়ল। বস্টন-লন্ডন-কলকাতা আকাশপথে এই লেখা হয়ে গেল। সেই সময়ে মনের মধ্যে চিন্তাধারা যে ভাবে এসেছিল সেভাবেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। হয়তো কাহিনী তাই মাঝে মাঝে ছিন্নসূত্র মনে হতে পারে।

আমাকে শিশিরকুমার জীবনে প্রথম যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা দিল্লি থেকে লেখা। ট্রেনে চেপে সারারাত, সারাদিন কাটিয়ে দিল্লি পৌঁছেছেন। সেই ট্রেন যাত্রার বেশ সরস বর্ণনা দিয়েছেন, নাতিদীর্ঘ চিঠির শেষে লিখলেন—

"এত কথা যে লিখলাম তার থেকে কী খবর পেলে? বিশেষ কিছুই না। এটা আর কী এমন Journey? এর চেয়ে অনেক বড় Journey বাকি রয়েছে। সে বিষয়ে তুমি লিখবে—আমি পাশে থাকব মাত্র।"

সেই দীর্ঘ জার্নির কথা আমি কোনওদিন লিখে উঠতে পারব কি না জানি না। কিছু খণ্ডচিত্র যেমন মনে এসেছিল ধরা আছে এই লেখাতে।

শিশিরকুমার বরাবরই একজন পাবলিক পার্সন—বলা যায় জনসেবক। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে এক বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে বরাবরই ওঁর অন্তরের যোগ। তরুণ বয়সে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীর জীবন। সেই জীবনের রেশ টেনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসুর কর্ম ও জীবন সংরক্ষণের দায় বহন করে গেলেন চিরদিন। এ ছাড়াও আছে চিকিৎসক হিসেবে শিশু হাসপাতালের কাজ, দেশের শিশু কল্যাণের চিন্তা।

নেতাজি ভবনের কাজ করতে গিয়ে ওঁকে অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। হয়তো তাতে বেদনা ছিল, কখনও লাঞ্ছনাও ছিল ভাগ্যে। আবার অনেক মানুষের শুভ কামনাও ছিল, আশীর্বাদও ছিল। নেতাজি ভবনের কাজে ওঁকে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে এসেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন নেতাজির পত্নী আমাদের কাকিমা এমিলিয়ে। ওঁর এবং অনিতার বরাবরই বিশেষ ভরসা শিশিরকুমারের কাজের প্রতি। বিশেষ করে এমিলিয়ে সর্বদা ওঁকে বলতেন, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, কোনওদিকে চেয়ো না। অনেক সংকটের মুহূর্তে শিশিরকুমারকে প্রেরণা দিয়েছেন উনি।

প্রতিবছরই ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনের উৎসব হয়ে যাবার পর আন্টি এমিলিয়ের ফোন আসবেই, কেমন হল সব? আমার ইচ্ছে করে চুপি চুপি গিয়ে একবার উপস্থিত থাকি, কেউ আমাকে চিনবে না। আমরা হাসতাম, তা হবার নয়, এলে জানিয়ে আসতে হবে।

খুব খুশি হয়েছিলেন যখন এমিলিয়ে ও সুভাষচন্দ্রের চিঠিপত্রের সংকলনটি প্রকাশিত হল।

শেষ যেবার ২৩ জানুয়ারির পর ওঁর ফোন এল আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। ফোন ধরতেই উনি বললেন—'আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক ইউ অ্যান্ড শিশির।' আমি অবাক হলাম। কেন? মনে ভাবার চেষ্টা করছি এর মধ্যে কি কিছু ঘটেছে? কোনও উপহার পাঠিয়েছি কি? কই না তো। উনি আবারও বললেন—'আই ওয়ানট্ টু থ্যাংক ইউ অ্যান্ড শিশির ফর অল দ্যাট ইউ ডিড।' আমি খুব ভয় পেলাম। এ সব কথা কেন, তবে কি উনি আর বেশিদিন নেই। অনিতা তখন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিল। আমি বললাম, অনিতার জন্য ভেবো না, শি উইল গেট ওয়েল সুন—শিগগির ভাল হয়ে যাবে। আমরাও আসব তোমাকে দেখতে যেমন আসি প্রতি বছর। অনিতা ভাল হয়ে ফিরল কিন্তু উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

একটা ভাল কাজ করার মধ্যে যে পরিতৃপ্তি থাকে শিশিরকুমার জীবনে তা পেয়েছিলেন, সেই আনন্দ তাঁর বাইরের অভিব্যক্তিতে ফুটে উঠত। অন্তরের সেই পূর্ণতার জন্যই হয়তো বয়সের তুলনায় উনি চিরদিন চেহারায় তরুণ ছিলেন। মৃত্যুর দুদিন আগে তোলা ছবিতেও দেখি সেই তারুণ্যে ভরা আনন্দময় প্রকাশ। আমাদের বন্ধুরা বলতেন শিশিরকুমারের জন্যই বোধ করি ইংরেজ কবি লিখেছিলেন—"এইজ ক্যানট্ উইদার দি—" বয়স তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যে কাজ উনি করতে ভালবাসতেন সেই নেতাজির কাজ করতে করতেই উনি চলে গেলেন। সে দিনও সারা সকাল কাজ করেছেন নেতাজি ভবনে, অনেকের সঙ্গে দেখা করেছেন, অনেক কাগজপত্র দেখেছেন, সই করেছেন—নিজের প্রিয় কাজ করতে করতে চলে যাওয়া ভাগ্যের কথা।

আমাদের এক রাজনীতিক বন্ধু ছিলেন তিনি শিশিরকুমার সম্বন্ধে বলতেন—জীবনে নানারকম মানুষজন দেখেছি, রাজনীতিক নেতাও কম দেখিনি, কিন্তু এই মানুষটা একটু অন্যরকম। সেই অন্যরকম মানুষের অন্যরকম জীবন কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবার আশায় এই খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্র।

১৪ আগস্ট, ২০০১ কৃষ্ণা বসু
'বসুন্ধরা'
৯০ শরৎ বসু রোড
কলকাতা

সূ চি

যে তরণীখানি ১৩

ডাক্তার সাহেব ২৫

নেতাজিকে নিয়ে ৩৪

আরও নেতাজি ৫০

পরিনির্বাণ ৬৬

শিশিরকুমার বসুর কয়েকটি কবিতা ৭৮

সেজোকাকা গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। চা খাওয়ার পর আমার দুজনে নতুন শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউট অব চাইলড্ হেলথ্-এ যাব। হাসপাতালের দোতলা বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়ে এসেছে—দোতলায় মেঝে মাজাঘষা চলছে।

গাড়ি থেকে নেমে ট্রিংকাতে প্রবেশ করে ডানদিকে পথের ধারে বেশ ভাল একটি টেবিলের দিকে আমি এগিয়ে গেলাম। পিছন ফিরে দেখি কীর্তি আমার সঙ্গে নেই। সে সম্পূর্ণ উলটো দিকে আর একটা টেবিলের দিকে সোজা চলে গেছে। সে টেবিলে একজন প্রিয়দর্শন ব্যক্তি ও একটি সুন্দরী মহিলা বসে আছেন তাদের সঙ্গে সে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তারা আমাকেও ওদিকে আহ্বান করছে।

কীর্তির ব্যাপার দেখে আমি খুবই বিরক্ত। সে একটু আমতা আমতা করে আমাকে বলল, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এ হল বুইদিদি—কতদিন পরে দেখা।' কাছে গিয়ে আমি দুজনকেই চিনতে পারলাম। একজন ডা. শিশিরকুমার বসু। সেজোকাকা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর চারপাশে যেসব তরুণ পিডিয়াট্রিক ডাক্তারদের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদেরই একজন। এর আগেও দু-তিনবার দেখেছি সেজোকাকার বাড়িতে বা তার দেওয়া পার্টিতে। তবে অন্যদের সঙ্গে যেমন ডা. সুনীল রায়, ডা. শক্তি ভট্টাচার্য আমার খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল, এঁকে তত চিনি না। মহিলাটি রমা বা বুই তাকেও আশুতোষ কলেজে দেখেছি। ওর মুখখানা খুবই মিষ্টি, স্বভাবও তাই। বোসবাড়ির গোল মুখ, তাতে একটা আলগা শ্রী।

ওদের দুই ভাইবোনের সঙ্গে কীর্তি ও আমি দুই ভাইবোন বসে গেলাম। আমি অবশ্য কীর্তিকে একটা শীতল চাহনি দিলাম, মনে মনে বিব্রত বোধ করলাম। ডা. বসুই চা পেস্ট্রি অর্ডার করলেন । কীর্তি ও তার বুইদিদি ছেলেবেলার গল্প জুড়ে দিল। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে খেলা করা বা চক্রবেড়িয়ায় মেজোকাকা নীরদচন্দ্রের বাড়িতে বুই-পুতুল-বাবু এদের জন্মদিনের নিমন্ত্রণ খাওয়া। ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দ আলাপচারিতা শুরু হল।

আমিও বললাম যে আমাদের বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য ধনুর হাত ধরে ধ্রুব ও কীর্তি দুই ভাইয়ের সঙ্গে আমিও উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ছেলেবেলায় বেশ কয়েকবার গিয়েছি। আমার স্মৃতিতে আছে সুন্দর ফুলের বাগান আর ওপরে কোথাও অনেক পাখি তাদের কর্কশ ডাকাডাকি। ওরা বলল, তাই তো তোমার মনে আছে, হ্যাঁ সুন্দর ফুলবাগান ছিল পাখিও ছিল।

আমি বললাম, কুকুর ছিল তাও মনে আছে। মেজোকাকা প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে উডবার্ন পার্ক থেকে আমাদের ডোভার লেনের বাড়িতে হাজির হতেন,

সঙ্গে দীর্ঘ, ছিপছিপে হরিণের মতো চেহারার গ্রেট ডেন, প্রায় মেজোকাকারই সমান। তার নাম যতদূর মনে পড়ে, ছিল ফ্ল্যাশ। ওরা হাঁ হাঁ করে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্ল্যাশ ছিল। একবার একটা ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরছানা উডবার্ন পার্কের বাড়ি থেকে মেজোকাকা আমাকে দিলেন, আমি পুষেছিলাম, তার নাম বিজলি। অতীতের ও ছেলেবেলার স্মৃতিচারণায় সময় কেটে গেল।

বিলটা যখন এল আর একটি বিব্রত মুহূর্ত। আমার হাতে লাল ভেলভেটের ছোট ব্যাগ। আমি কটমট করে কীর্তির দিকে চেয়ে ব্যাগে হাত রাখলাম। আমার তো খাওয়াবার কথা, তাই না? ডা. বসু তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুভাবে বললেন, আজকে আমিই দিই, ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

বিধাতা অন্তরালে বোধ করি হেসেছিলেন। সেই ভবিষ্যৎ যে ১৪ আগস্ট ১৯৫৫ সাল থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের একত্র জীবনযাপন হবে তা কে জানত!

গাড়ি এসে ইনস্টিটিউট অব চাইলড্ হেলথ্-এ থামল। সেজোকাকা ও আমাদের আন্ট অমলা সেখানে অপেক্ষা করছেন। আমি নামতেই আমার দিকে এক নজর দেখে আন্ট অমলা তার স্বাভাবিক ছটফটে ভঙ্গিতে বলে উঠলেন "সি ইজ লুকিং সো প্রিটি"—সেজোকাকার দিক থেকে সাড়া না পেয়ে অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন "ইজন্ট শি লুকিং ভেরি প্রিটি?" সেজোকাকা ও কীর্তি নির্বিকার।

আমি বেশ অবাক হয়ে যাচ্ছি। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা সাদা চান্দেরি শাড়ি পরে আছি। সাদার ওপর জরির কাজ। একই ব্লাউজ। হাতে লাল মখমলের বটুয়া। আমি কোনওদিনই বিশেষ সাজগোজ করিনি। প্রকৃতপক্ষে জানতামও না কী করে করতে হয়। বাবা শিখিয়েছিলেন পড়াশুনো ছাড়া ফটোগ্রাফি, টাইপিং, কলা-সমালোচনা। মেজোকাকা দিল্লিতে শেখালেন সাইকেল চালানো। সেজোকাকার কাছে হাতে খড়ি বন্দুক চালানো, .২২ বোরের রাইফেল আমার নামে কিনেছিলেন সেজোকাকা। রমণীসুলভ শিক্ষা বিশেষ পাইনি 'পুরুষেরই বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা, লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা।...'

ট্রিংকার এই টি-পার্টির অন্তরালে যে গভীর ষড়যন্ত্র ছিল তা মা আমার কাছে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন। অপর পক্ষের সঙ্গে কীর্তি, মা, আন্ট অমলা সবাই ষড়যন্ত্রের অংশীদার। আমি খুবই বিরক্ত হলাম। 'কেন এ সব করতে যাও? ওরা কী ভাবল কে জানে।' মা নিরুপায়, বললেন, নয়তো তুমি তো রাজি হতে না। কথাটা ঠিক।

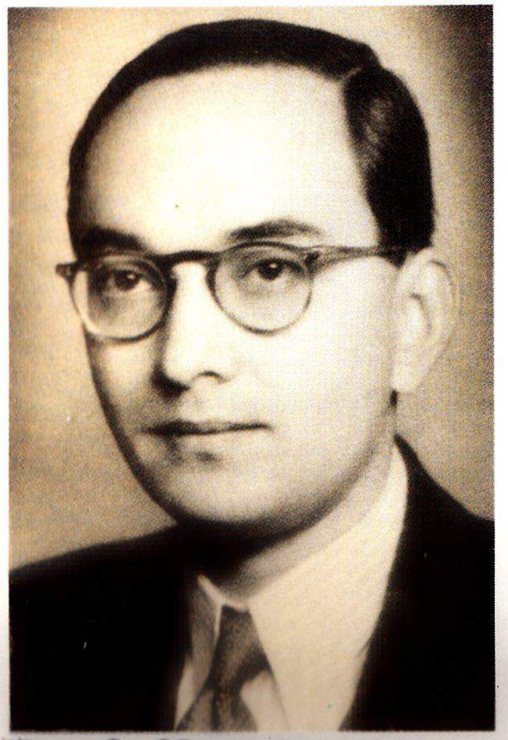
বাবার ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল গ্র্যাজুয়েশনের আগে বিয়ের কোনও কথা নয়। এম এ পরীক্ষার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছি মা জিজ্ঞাসা করলেন, বিয়ে করবে তো? নৈশ্চয় করব। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী ছিলাম। ইংরেজি নভেল-এ স্পিনস্টার' বা অবিবাহিত বয়স্কা মহিলাদের যেরকম খিটখিটে চরিত্রের দেখানো হত, তাইতে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম 'স্পিনস্টার' হওয়া নৈব নৈব চ।

কিন্তু মুশকিল হল বিয়েটা করব কী করে। সামনে দুটো পথ, নিজে নিজে কাউকে পছন্দ করে নেওয়া। নয়তো বাবা-মা আত্মীয়স্বজন দেখে শুনে যা করবেন তাতে মত দেওয়া। প্রথম পন্থায় অসুবিধা হল সেকালে স্বয়ংবরা হওয়া কঠিন ছিল। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ কোথায়? আমার বন্ধু বলতে আমার কাকারা, খুড়তুতো মামাতো ভাইয়েরা। সবাই মিলে সাহিত্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, খুব জমিয়ে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুবই প্রটেকটেড বা সুরক্ষিত জীবনযাত্রা।

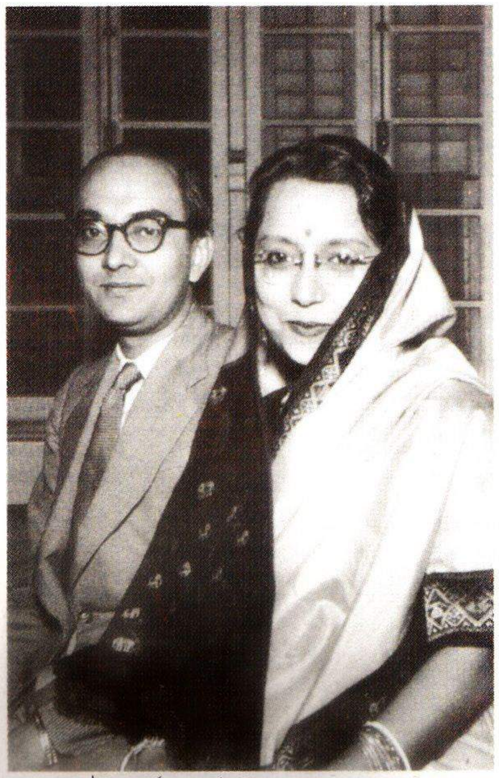
বি এ পাশ করার পর বাইরের জগতের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় হল। ফরাসি ক্লাসে পড়তে যাই। সেখানে সহপাঠী আমার সমবয়স্ক ছেলেরা যেমন, তেমনি বয়সে বড়ও অনেক। সেই প্রথম অবাক হয়ে লক্ষ করলাম কেউ গায়ে পড়ে আলাপ করতে চায়, কেউ ট্রামরাস্তা অবধি পৌঁছে দিতে চায়, অথবা অকারণে বাড়িতে ফোন করে।

আমার অবাক হবার কারণ আমার অনভিজ্ঞতা। আমার সহপাঠিনীরা অনেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। আমার সরল বিস্ময়ে তারা কৌতুক বোধ করত। এম এ পড়তে গিয়ে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অনেক সহপাঠী পেলাম। তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল তাদের সঙ্গে এমন এক অনাবিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন হল যা আজীবন রয়ে গেল। চারপাশে অনেক রোমান্টিক ঘটনা ঘটছিল। কিন্তু আমাদের ছিল প্রগাঢ় সখ্যতা। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাস্য পরিহাসও হত। ধৃতির বিশেষ দুঃখ ছিল, 'ইস, একটা স্ক্যান্ডাল পর্যন্ত রটল না—' অন্যদের ক্ষেত্রে রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—।'

দ্বিতীয় যে পন্থায় বিয়ে ঠিক হয় যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ' সেখানে মার বিশেষ অসুবিধার কারণ হলাম আমি আর আমার বাবা। সেকালে বিয়ে ঠিক হবার আগে 'মেয়ে দেখা' নামে একটি বিশেষ পর্ব ছিল। আমি দেখেছি আমার মাসতুতো দিদিদের অন্য আত্মীয়াদের এর ভিতর দিয়ে যেতে। সেজেগুজে মাথা নিচু করে বসা আর বরপক্ষের নানান অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া। এ ব্যাপারে আমি বিদ্রোহিণী। মাকে পরিষ্কার বলে



ইউরোপে শিশু চিকিৎসার পাঠ শেষ করে দেশে ফিরলেন তরুণ ডাক্তার শিশিরকুমার বসু



এক নম্বর উডবার্ন পার্কে, ডিসেম্বর ১৯৫৫



জওহরলাল নেহরুকে নেতাজি মিউজিয়াম দেখাচ্ছেন শিশিরকুমার বসু



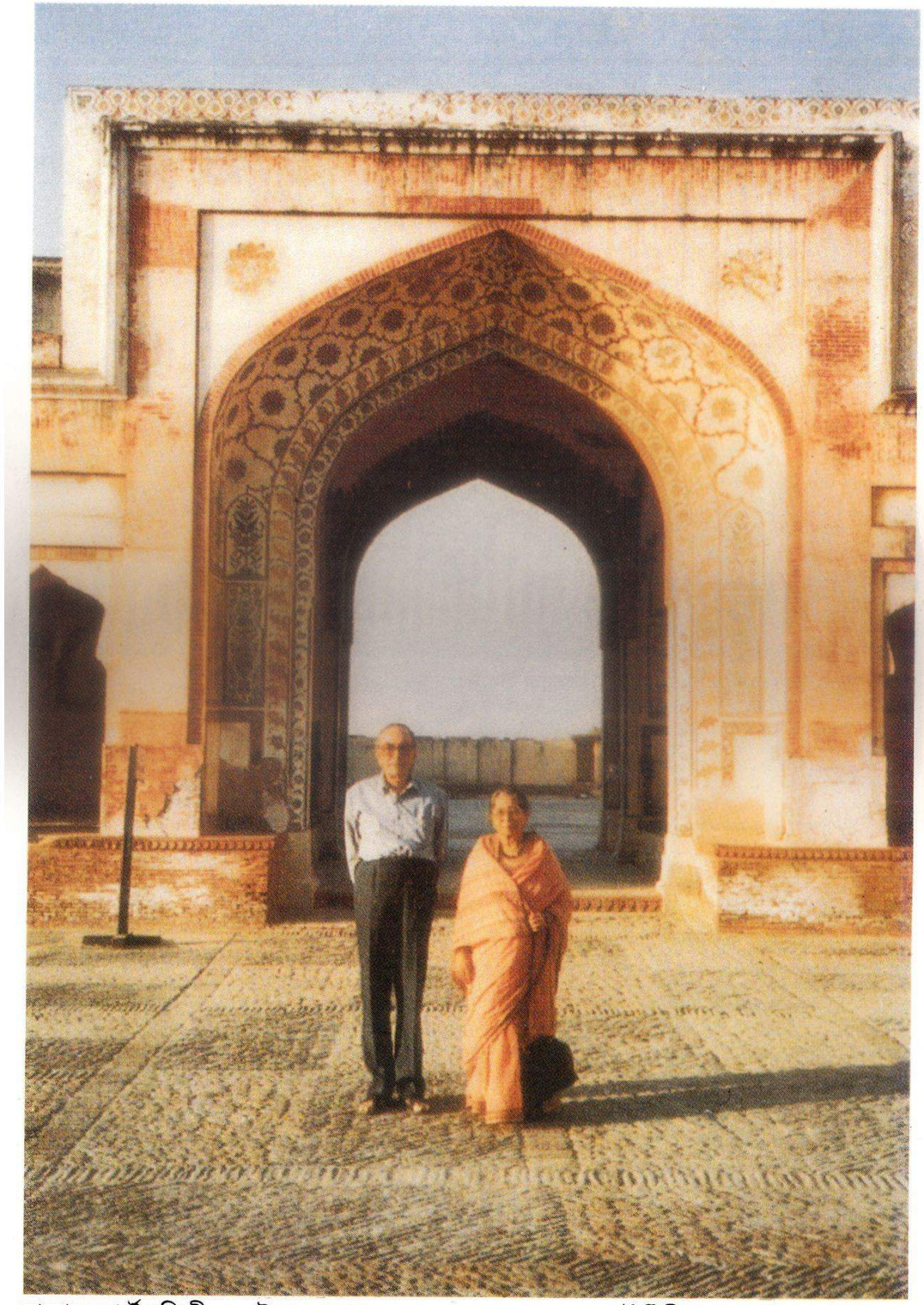
সোর্ড সেরিমনি, জেনারেল ফুজিয়ারা নেতাজির তরবারি তুলে দিলেন শিশিরকুমার বসুর হাতে



আন্তর্জাতিক নেতাজি সেমিনার বসেছে নেতাজি ভবনে।



সপরিবার শিশিরকুমার বসু রসুন্ধরা গৃহে



লাহোর ফোর্টে বন্দিজীবন কাটাবার পঞ্চাশবছর পরে আবার লাহোর ফোর্টে শিশিরকুমার



নতুন করে সাজানো নেতাজি মিউজিয়ামে প্রেসের সঙ্গে কথা বলছেন শিশিরকুমার



শেষ ছবি ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০



কন্যা শর্মিলার আঁকা কার্টুন

দেওয়া আছে আমার দ্বারা হবে না। মা খুবই কাতর। তা হলে আমি কী করে কী করব। তা জানি না।

বাবাকে নিয়ে অন্য ধরনের মুশকিল। কোনও এক নামকরা রাজনীতিক পরিবারে বিয়ের কথা হল, প্রাক স্বাধীনতা ও ঠিক স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এদের বেশ নাম ডাক। তবে যে নেতার জন্য এই পরিচয় ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত। বাবা তো বেঁকে বসলেন। ওকে বোঝানো হল ছেলেটি তো ভাল, তার কোনও দোষ নেই। তার রাজনীতিক কাকার যদি দুর্নাম থাকে তো কী করা। বাবা বললেন—কখনওই নয়, ব্লাডের মধ্যে করাপশন। এমনি ভাবে চলল। কোথায় বিয়ের প্রস্তাব করতে গিয়ে শোনা গেল ছেলের দূর সম্পর্কের এক মামার মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট আছে। বাবা বললেন, জিন-এর মধ্যে পাগলামি এখানে চলবে না। একটি যথেষ্ট ভাল সম্বন্ধ বাবা শুধু পাত্রপক্ষের পদবি পছন্দ হয়নি বলে বাতিল করলেন।

সত্যি মাকে দোষ দেওয়া যায় না। মা তাই নানান অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম শুরু করলেন। হঠাৎ বিনা নোটিশে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু লোকজন বিভিন্ন অছিলায় বাড়িতে হাজির হয়ে যেতে লাগল। নয়তো সন্দেহজনক ভাবে আচমকা আমার সঙ্গে কারও দেখা বা আলাপ হয়ে যায়। মা'র এই ধরনের উপায়হীন আচরণের একটি হল ট্রিংকাতে টি-পার্টি।

ইতিমধ্যে একটি ছোট ঘটনার কথা বলি। সামনে এম এ পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে আর ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাই, পড়াশুনো করি, নোট নিই। এ হেন সময়ে এক স্বল্প পরিচিত যুবক ইংরেজি কায়দায় আমাকে প্রপোজ করল অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাব দিল। উইল ইউ ম্যারি মি? শুনে তো আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কী সর্বনাশ। ইংরেজি সাহিত্যে এ সব পড়া আছে কিন্তু জীবনটা তো জেন অস্টিনের নভেল নয়। কী করি। ভেবে চিন্তে হ্যাঁ বলব ঠিক করে ফেললাম। বাড়িতে মা ও কাকারা খুশি। একটি ছেলে, একটি বাড়ি, একটি গাড়ি বৈষয়িক দিক দিয়ে মন্দ কী! বাড়িটা কেমন দেখার জন্য নকাকা বালিগঞ্জের এক নির্জন সাহেবি রাস্তায় মর্নিং ওয়াক করা শুরু করলেন।

বাবা আমাকে তার স্টাডিতে ডেকে পাঠালেন। তুমি কি এই বিয়ে সত্যি করতে চাও? বাবার সোজা প্রশ্ন। আমি বললাম, একেবারেই করতে চাই না, এখানে বিয়ে করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তা হলে? বাবা আমার দিকে তাকালেন। আমি বিব্রতভাবে বললাম—কাউকে না কাউকে যখন বিয়ে করতেই হবে ভাবলাম চাইছে যখন এখানেই করি। তুমি তো জানো মেয়ে দেখাটেখা আমার দ্বারা হবে না। অন্তত এখানে নিজে থেকে একজন চাইছে।

তা ছাড়া দ্বিতীয় একটা কারণ আছে আরও আমতা আমতা করে বলি। সত্যিই খুব চাইছে। না বলে দিলে মনে দুঃখ পাবে।

বাবা আমার অবিমৃশ্যকারিতায় কী ভাবলেন জানি না। শান্তভাবে বললেন—দেখো খুকু কাউকে করুণা করে বিয়ে করা যায় না, ভুল হবে। তুমি ঠিক করে বলো এই বিয়ে করতে চাও কি চাও না। আমি দ্বিধাহীনভাবে বললাম, চাই না। অতএব মুক্তি।

আমার ও শিশিরকুমারের বিয়ে যে ঠিক হল এটাকে কোন ধরনের বিয়ে বলা যায়। পুরোপুরি অ্যারেঞ্জড বলা যায় কি? শোনা গেল অপরপক্ষে অভিভাবক বা মতাদি দেবার কেউ নেই। বাবা শরৎচন্দ্র বসু তো পাঁচ বছর আগেই গত হয়েছেন। মা বিভাবতী মারা গেছেন এক বছর আগে। শিশির যদি হ্যাঁ বলে তো হ্যাঁ যদি না বলে তবে তাই। ট্রিংকা পর্বের একদিন পরে জানা গেল শিশির হ্যাঁ বলেছে। আমি হেসে বলতাম 'পাকিস্তান ডে'-তে দেখা হল আর ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে অর্থাৎ ১৬ আগস্ট এনগেজড হলাম।

ইতিমধ্যে আর একবার বাবার স্টাডিতে তলব পড়ল। তোমার কোনও আপত্তি নেই তো, বাবা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, আছে। বাবা নিঃশব্দে তাকালেন। আমি বললাম, যতদূর জানি ওরা খুব বড়লোক—আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার মিল হবে না।

বাবা একটু চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—শরৎবাবু বড়লোক তো বটেই, একাধিক অর্থে বড়লোক। উনি খুব বড় মাপের মানুষ। তোমার মেজোকাকা ছাড়া আমিও ওঁকে ভালভাবে চিনতাম। আইনের ব্যাপারে উডবার্ন পার্কের দক্ষিণের বারান্দায় অনেকবার কনসালটেশন করেছি। আর খুব নন-কনফর্মিস্ট বুঝলে—আমরাও যেমন।

আর তোমার জানা দরকার শরৎবাবুর মৃত্যুর পর সে অর্থে ওরা বড়লোক নেই। দেশের কাজে শরৎবাবু অনেক ঋণ রেখে গেছেন। ফণীকাকা (চিফ জাস্টিস ফণীভূষণ চক্রবর্তী) জানিয়েছেন উডবার্ন পার্কের বাড়ি মর্টগেজ করা আছে। ছাড়ানো হয়েছে কি না জানা নেই। আর শিশির বাবার মৃত্যুর পর বিলেত থেকে ফিরেছে। ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে অনেক দেরি। মেডিকেল কলেজে কাজ করে, ভাল কাজ কিন্তু টাকা পয়সা বলতে গেলে নেই।

সেদিন আমার কপর্দকহীন, ডাক্তারি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত ভাবী স্বামীর সম্পর্কে আমি খুব আশ্বস্ত বোধ করলাম। আমার মনে যে ভীতি ছিল তা দূর হল।

এর পরবর্তী দৃশ্য আমার শোবার ঘরে বিছানায় আমাকে ঘিরে বসে আছেন আন্ট অমলা, নকাকা মন্মথচন্দ্র, ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র, কীর্তি তো আছেই। নকাকা বলছেন—দেখো তোমার মনে যা আছে আগে থেকেই বলে ফেলো।

সেবার অচেনা লোকের বাড়ির সামনে ক'দিন মর্নিং ওয়াক করলাম তারপর তুমি বললে ওখানে বিয়ে করবে না। আবার সে রকম হবে না তো? আন্ট অমলা ছটফটে অসহিষ্ণু প্রকৃতির, তিনি তাড়াতাড়ি বললেন—নো, নো—কৃষ্ণা লাইকস শিশির। আমাকে নীরব দেখে বললেন—ডোন্ট ইউ লাইক শিশির? আমি চুপ। আন্ট অমলা তৃতীয় ধাপে পৌঁছলেন—বললেন—হোয়াট, কৃষ্ণা ডাজ নট লাইক শিশির—তা হলে কী হবে। কীর্তি বলল নট সো ফাস্ট—ধীরে রজনী ধীরে।

পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছিল। আমি উঠে গিয়ে ধরলাম। ওপাশে ট্রিংকা ষড়যন্ত্রের অন্যতম ষড়যন্ত্রী কীর্তির বুইদিদি। সে বললে, 'কৃষ্ণা, তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য বাড়ির সকলে উৎসুক হয়ে আছে। শনিবার তুমি আছ? ওরা কেউ কেউ যাবে। দিদি, দাদা যারা বাইরে আছে, তাদেরও সব খবর দেওয়া হয়ে গেছে। বুইর স্বামী ডা. শচীশ রায় আমি জানতাম। মৃদু গলায় বললাম ডা. রায়ের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়নি। ওদিকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর—আরে ও তো কবে তোমার সঙ্গে আলাপ হবে বলে লাফাচ্ছে। খানিক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার পর টেলিফোন রেখে শোবার ঘরে ফিরলাম।

আন্ট অমলা আর একবার উইল শি অর ওনট্ শি—আলোচনা শুরু করলেন। আমি হাত দিয়ে থামিয়ে বললাম—আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এ বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

মেজোভাশুর অমিয়নাথ জানালেন ওরা ডিসেম্বরে বিয়ে চান। আর ৯ ডিসেম্বর, সেদিন ওদের বাবা-মা শরৎচন্দ্র ও বিভাবতীর বিয়ের তারিখ। গৌরীনাথ শাস্ত্রী দেখেছেন এ বছরও ৯ ডিসেম্বর শুভ দিন। বাবা বললেন বেশ তাই হোক।

আগস্ট থেকে ডিসেম্বর তিন-চার মাস কেমন কাটল? আমাদের অনেকবারই দেখা হল। কখনও আমাদের বাড়ি খাওয়া দাওয়া, প্রায়ই সেজোকাকার বাড়ি ডিনার, বেশির ভাগই সপরিবার। আমি পরে ওকে বলতাম ভাবী স্ত্রীর চাইতে তোমার তো খাওয়াদাওয়ার দিকেই বেশি চোখ। তা খেতে উনি ভালবাসতেন, ভাল খাওয়া দাওয়া, ভোজনবিলাসী ওর বাবাকাকার মতোই। একদিন আমার দিদি ও ভগ্নিপতি শোভা ও সুনীল জানার বাড়ি দেখা হল। সেদিনের একটা ছবি সুনীলদার তোলা আজও আছে। শুনলাম ভিয়েনা থেকে কাকিমা এমিলিয়ে আমার ছবি চেয়েছেন। সুনীলের তোলা সেই যুগল ছবি পাঠানো হল। সুনীলের বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে উনি আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিলেন। সে সময়ে দিদিমা আমাদের কাছে ছিলেন। আমরা দুজনে একা এসেছি শুনে দিদিমা যেন একটু চিন্তিত হলেন। আবার আমার দিকে এক

নজর তাকিয়ে বললেন, একটা ভাল শাড়িও তো পরতে পারতিস, একদম সাজগোজ নেই। তখন আমি শুধুই সাদা তাঁতের শাড়ি পরতাম।

এই সময়ের একবারের দেখা হওয়াটা আমার অন্য কারণে মনে আছে। সেজোকাকা কয়েকদিনের জন্য কলকাতার বাইরে গেছেন। যাবার আগে আন্ট অমলাকে আদেশ দিয়ে গেছেন—আমি থাকলে ওরা দুজনেই আড়ষ্ট হয়ে থাকে আমি না-থাকার সময়ে ওদের দুজনকে ডেকো।

আন্ট অমলা ও আমরা দুজন ক্রিক রো-এর বাড়িতে ডিনার খেলাম। উনি বেশ দেরিতে এলেন, ইন্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের কী একটা ইলেকশন ছিল। খাবার পরে দক্ষিণের বারান্দায় বসে আছি। হঠাৎ উনি ধীরে ধীরে নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলতে শুরু করলেন। ওর নিজের কথা ঠিক ব্যক্তিগত হত না—সব সময়ে ইতিহাস মিশ্রিত। ওঁর রাঙাকাকাবাবুর কথা, বাবার কথা, এলগিন রোড থেকে মহানিষ্ক্রমণের কথা—তারপর বন্দিজীবন-লালকেল্লা, লাহোর ফোর্ট। জেলখানা থেকে বার হবার পর ওকে ঘিরে মানুষের উচ্ছ্বাস, চারিদিকে 'বোস খানদান জিন্দাবাদ' ধ্বনি। কিন্তু বাবা বললেন, পড়াশুনো শেষ করো, নিজের পায়ে দাঁড়াও। আন্ট অমলা আর আমি নীরব শ্রোতা। বেশ একটা দীর্ঘ ইতিহাস—দেশের ইতিহাস। ওর যে জীবনে অন্য একটা দিক আছে সেটা যেন প্রকাশ হল। শুধুই একজন তরুণ ডাক্তার নন। কত রাত হয়েছে খেয়াল ছিল না। টেলিফোন বাজল মা উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করছেন। রাত একটা বেজেছে আমি ফিরিনি কেন। উনি একটু লজ্জিত হয়ে উঠে পড়লেন। এত রাতে সেজোকাকার ড্রাইভারের সঙ্গে আমাকে একা পাঠানো যাবে না। আন্ট অমলা মাকে বললেন কাল যাবে, আজ আমার কাছে থাক। উনি খুব শিভলরাস হয়ে বার বারই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইছিলেন। কিন্তু আন্ট অমলা অনড়, সামাজিক নীতির ব্যাপার—হয়তো ইম্প্রপার দেখাবে।

পরবর্তীকালে উনি আমাকে প্রায়ই শোনাতেন 'উঃ তোমার কাকিমা না কিছুতেই আমাকে বিশ্বাস করে তোমাকে ছাড়লেন না।'

অক্টোবরের শেষে শিলঙে স্পিকার সম্মেলন হল। শৈলবাবু বিধানসভার স্পিকার, বাবা অন্যতম সচিব। আমরা সম্মেলনে গেলাম। শিলঙের এই সম্মেলনে হঠাৎ আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা সর্বভারতীয় প্রচার পেয়ে গেল। মা অনেক আসাম সিল্ক ও মুগা কিনতে লাগলেন বিয়ের বাজার হিসেবে।

বিয়ের আয়োজনের ব্যাপারে বাবা তার আধুনিক মনস্কতার পরিচয় দিতে লাগলেন। গৌরীনাথ শাস্ত্রী ওবাড়ির কুলপুরোহিত। লগ্ন দিয়েছেন গোধূলি। শুনে বাবা খুব খুশি। গোধূলি লগ্নে বিবাহ হয়ে যাবে—তারপর বরবধূ ঘুরে ঘুরে অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে অন্যদিকে বুফেতে খাবার ব্যবস্থা

থাকবে, সবাই পছন্দমতো খাবে। ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র এ সব ব্যাপারে খুব গোঁড়া। হঠাৎ 'আমি এই খ্রিস্টান বিয়েতে নেই' বলে ওয়াক আউট করলেন। আরে করো কী, ধরে বেঁধে ফিরিয়ে আনা হল। বাবাকে খুব ভয় দেখানো হল যে বসুবাড়ি অত্যন্ত গোঁড়া ও সংস্কার মেনে চলা পরিবার তোমার আধুনিকতা ওখানে অচল। বাবা পিছিয়ে গেলেন। পরে শুনে আমার স্বামী বলেছিলেন, কী আশ্চর্য আমার সঙ্গে কথা বলে নিলেই তো হত।

আর একটা পাশ্চাত্য রীতি বাবা চালু করলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কে কী দিতে চাও? নতুন সংসার পাততে যা কাজে লাগতে পারে তার লিস্টি হল। যে যেটা দিতে চায় বেছে নিল। ফলে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটল না। অথচ কফি পার্কোলেটর, ইলেকট্রিক কেটলি, ইস্ত্রি থেকে সুটকেস, হোল্ডঅল কিছু বাদ গেল না। বউভাতের সময় মনে আছে আমি এগারোখানা 'ভারত প্রেমকথা' বই পেয়েছিলাম আর সতেরোটা টেবিল ল্যাম্প, ফুলদানির অবস্থাও তথৈবচ। বিয়ের চিঠি অবশ্যই খুব শিল্পসম্মত হতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার ব্রত খুলে বসা হল।

ও বাড়ি থেকে বিবিধ নির্দেশ এল। বরের গাড়ি যেন ফুল দিয়ে সাজানো না হয়, শিশিরের পছন্দ নয়। অতএব নিরাভরণ গাড়ি গেল। বরের জন্য যেন সিংহাসনের ব্যবস্থা করা না হয়, শিশিরের পছন্দ নয়। সবাই একটু ঘাবড়ে গিয়ে মাটিতে একটা কার্পেট পাতা হল। এদিকে তারপর উনি সারাজীবন বলে এলেন, জানো তো আমাকে একটা শতরঞ্চি পেতে বসতে দিল। আরে সিংহাসন চাই না বলে কী শতরঞ্চি!

'বর এসেছে, বর এসেছে' একটা ধ্বনি উঠল। হঠাৎ দেখলাম ঘরে আমি একা বসে আছি কনের সাজে, লাল বেনারসি কপালে চন্দন। চারপাশে সখি ও রমণীকুল বর দেখতে ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে গেছে। সেই নির্জন ঘরে অনিলকাকা এসে ঢুকলেন। অনিল গাঙ্গুলি ব্যারিস্টার, বাবার পরম বন্ধু আবার বসুবাড়িরও ঘনিষ্ঠ। ওর দাদা চারু গাঙ্গুলি সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী, বন্ধু। অনিলকাকা গৃহী, কিন্তু অন্তরে ভক্ত সাধক। আমার কানের কাছে গান গেয়ে উঠলেন—"সাজায়ে দে মা তোর সন্তানে, যেন মুখ দেখে মা তোর ছেলে বলে সকলে চিনে..." উনি কী বলতে চাইলেন আমি বুঝলাম। শিশিরকুমার অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, গ্রিক দেবতার মতো চেহারা। কিন্তু সেটা বড় কথা নয় সত্যিই মুখ দেখে অন্তরের সৌন্দর্য ধরা পড়ত। 'মুখ দেখে মা তোর ছেলে বলে সকলে চিনে—'

বাইরে কী কাণ্ডকারখানা চলছে তা জানা ছিল না। পরে গল্প শুনেছি। কীর্তি রসিয়ে গল্প করত। বুঝলে দিদি শিশিরদা এসে বুইক গাড়ি থেকে নামলেন আর

অমনি ওপাশে দাঁড়ানো পুলিশ ব্যান্ডে ঝমঝম করে বেজে উঠল—"ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" ওদিকে সন্টুদার ওপরে ভার ছিল বর নামামাত্র সানাইবাদকদের অ্যালার্ট করতে হবে। সন্টুদা ওপরে নহবৎখানার দিকে মুখ করে ডেকে উঠল সা—না—ই অমনি প্যাঁ—প্যাঁ—প্যাঁ—ইমনরাগে সানাই। সে এক শব্দধ্বনির সমারোহ।

সামিয়ানার তলায় তখন অনেক বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ পৌঁছে গেছেন।

লেডি রাণু মুখার্জি তো আমার সাজঘরেই ঢুকে পড়েছিলেন। তখনও তোয়ালে জড়িয়ে বসে আছি। মনুয়াদি আমাকে কনে সাজাচ্ছে। আর মাঝেমাঝে বকাঝকা করছে—তোকে নিয়ে আর পারি না মাথায় চ্যাপচ্যাপ করে তেল দিয়েছিস কেন?

লেডি রাণু আমার সহপাঠিনী, ফরাসি ক্লাসে এক সঙ্গে পড়ি। তা ছাড়া কলাসমালোচক হিসেবে আমার অল্পবিস্তর সুনাম হয়েছে সব কলা প্রদর্শনীতে দেখা হয়। উনি আমার সঙ্গে সরাসরি ফরাসি ভাষায় বাক্যালাপ করেন। আমি কথ্য ফরাসিতে তখনও অত সড়গড় হইনি, কুণ্ঠিত ভাবে ঠেকে ঠেকে বলি।

সামিয়ানার তলায় সমবেত অতিথিদের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল । বাবা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অন্যতম সচিব। তাই বিভিন্ন রাজনীতিক দলের বিধায়কেরা হাজির। বাবার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন কলকাতার শিল্পীরা, বিশেষ করে ক্যালকাটা গ্রুপের অনেকে। শিল্পী গোপাল ঘোষ অত্যন্ত যত্ন করে বিয়ের পিঁড়ি এঁকে দিয়েছেন বর ও বধূর। আমাকে নিজের আঁকা চিল্কাহ্রদের ছবি বিবাহে উপহার দিয়েছেন। অতুল বসু এসে একখানা যামিনী রায় হাতে দিয়ে বললেন—কৃষ্ণা, যামিনীদাকে সামনে বসিয়ে এটা আঁকিয়ে এনেছি। ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত আছেন—চারুদা বলতে অজ্ঞান ছিলেন।

মেজোকাকা নীরদচন্দ্রের বন্ধুরা লেখক সাহিত্যিক। অমল হোম, আমরা অমল জ্যাঠামশাই বলতাম এসেছিলেন। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বাবা মেজোকাকা দুজনেরই বন্ধু। এসে আমার হাতে—মহাভারত তুলে দিলেন। সেজোকাকা ডা. ক্ষীরোদচন্দ্রর বন্ধুরা দিকপাল ডাক্তার। তাঁরাও আছেন।

আমার বিয়ে ঠিক হয়ে থেকে আমার ইউনিভার্সিটি সহপাঠীদের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে পিঁড়িতে বসিয়ে তারা সাতপাক ঘোরাবে ঠিক করেছে। আগের দিন রাত্রে ধৃতিকান্ত হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। এই যে কৃষ্ণা, তোমার ওজনটা কত বলো তো? আমরা একটা ক্যারিয়িং কমিটি করেছি—বেণু (বিনোদকিশোর) কোন দিকে ধরবে, আমি কী ভাবে ধরলে ব্যালান্স হবে এই সব সিরিয়াস ব্যাপার স্থির করতে হবে।

আমার সেই ক্যারিয়িং কমিটি ভাল কারুকাজ করা শাল গায়ে সেজেগুজে

উপস্থিত হয়ে গেছে। বিনোদকিশোর ও ধৃতিকান্ত আমার হাতে একটা লাল মখমলের বাক্স ধরিয়ে দিয়ে বলল—খুলে দেখো। দেখলাম ভিতরে একটি সুদৃশ্য গলার হার। কিন্তু সেটা দেখানো ওদের উদ্দেশ্য নয়—চিরকুটে কী লেখা আছে দেখো। চিরকুটে লেখা আছে—টু গোলডিলকস্ ফ্রম হার টু বেয়ারস—দি থার্ড বিয়িং ইন ইংলন্ড (To Goldilocks from her two bears, the third being in England)। ধৃতি, বিনোদ, অরুণ দাশগুপ্ত, ও আমি এম এ পড়ার সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক তারক সেন মশাইর ভক্ত ছাত্র। রোজ ইউনিভার্সিটির উঠোন পার হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠ পেরিয়ে লাইব্রেরি ঘরের ছোট কিউবিকিল-এ দীর্ঘ ক্লাস করি। সেই আনাগোনার সূত্রে আমাদের একটা ডাকনাম চালু হয়ে গিয়েছিল—গোলডিলকস্ অ্যান্ড হার থ্রি বেয়ারস। তৃতীয়জন অরুণ আমার বিয়ের সময়ে বিলেতে। ধৃতি বললে কীরকম ইংরেজি লিখেছি দেখো—দি থার্ড বিয়িং ইন ইংলন্ড—একেবারে তারক সেনের কায়দায়। অন্য সহপাঠীদের মধ্যে কাজলও তখন অক্সফোর্ডে। রানি সকালে গায়ে হলুদের সময় থেকেই আছে।

বিবাহ শুরু হলে পর আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্ত্রোচ্চারণ শুনছি। আমি নিজে সংস্কৃতের ভাল ছাত্রী ছিলাম। প্রতিটি মন্ত্র বিশুদ্ধ উচ্চারণে, বলার কায়দায় গমগম করছে। যিনি বলছেন তিনি মাঝেমাঝেই ইংরেজিতে বা বাংলাতে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন সমবেত দর্শকদের কাছে। এই বিবাহের পুরোহিত ছিলেন গৌরীনাথ শাস্ত্রী।

আমার শিশুকন্যার জন্মের পর গৌরীনাথ বলেছিলেন, 'তোমার বিয়ে আমি দিয়েছি, বেঁচে থাকলে তোমার মেয়ের বিয়ে আমিই দেব' তিনি কথা রেখেছিলেন। আমার বিয়ের পঁয়ত্রিশ বছর পরে আমার কন্যা শর্মিলার বিবাহ উনিই দেন। বয়স হয়েছিল—কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন 'দিব্যি আছি হে'। শর্মিলার বিয়ের অল্প পরে উনি মারা যান।

আমাদের বাড়িতে খুব গানের চল। জন্ম মৃত্যু বিবাহ অথবা অকারণে সবাই গান ধরে। ভাবলে অবাক লাগে আমার বিয়ের রাত্রে কিন্তু গান হয়নি। অথচ গাইয়ে বাজিয়ে কাকারা, জ্যাঠতুতো পিসতুতো দাদা দিদিরা সকলেই ছিল। মনে হয় বিরাট আয়োজনের ধাক্কায় সকলে কাহিল হয়ে পড়েছিল। নকাকা ও নতুনকাকা মন্মথচন্দ্র ও হিরন্ময় রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়ার ভার নিয়েছেন। সম্প্রদান কে করবে কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছিল, সেজোকাকা বললেন—মেজদা যখন দিল্লি থেকে আসতে পারছে না আমাকেই সম্প্রদান করতে হবে। কিন্তু ঠিক হল অবিবাহিত ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র সম্প্রদান করবেন। সেজোকাকা না থাকলে সমাগত অভ্যাগত ও বিশেষ করে বয়যাত্রীদের কে

দেখাশোনা করবে। এদিকে ছোটকাকা বিনোদচন্দ্র খুব গোঁড়া প্রকৃতির, সব সংস্কার মেনে চলেন মাঝে মাঝেই রেগে ওঠেন, কিছু মনঃপূত না-হলেই ওয়াক আউট করেন। নকাকা মন্মথচন্দ্র কৌতুকের সঙ্গে বললেন "বিনু কন্যা সম্প্রদান করুক। তা হলে সকাল থেকে উপবাস করে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করে, এমন ব্যস্ত থাকবে—অন্য দিকে মন দিতে বা রাগারাগি করতে সময় পাবে না। সো লেট আস স্টার্ভ দি লায়ন।"

তবে সেদিন না-হলেও পরে গান হয়েছিল। যখন দ্বিরাগমনে ফিরে এলাম। উমা, রত্না, রমাদি সবাই গান গাইছে। রত্নার মধুর কণ্ঠ কানে বাজছে—আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর, ওগো অনেকদিনের পর—আজ আমার প্রাণের বঁধু এল আপন ঘর...।

উডবার্ন পার্কের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষে অনেক আত্মীয়স্বজন সমাগম হয়েছে। মাঝে হলঘরে আমাকে ঘিরে জেঠিমা-কাকিমা-মামিমারা বসে আছেন। একটু দূরে ভাশুরেরা ও অন্যরা দক্ষিণের বারান্দায় শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে বসা। সবাই ধরেছে, গান শোনাও। নতুন বউ ভাল গান গায় এমনি একটা রটনা হয়ে গেছে। ভজন গান ধরি—'নদীয়া গাহেরি নাও পুরানি ক্যায়সে উতরো পার প্রভুজি, ক্যায়সে উতরো পার।' বয়স্কা আত্মীয়দের ভজনগান ভাল লেগেছে।

কলেজ স্ট্রিটের মামাবাড়িতে মাম ও মামিমা নতুন বরবধূসহ সকলকে নেমন্তন্ন করেছেন। উজ্জ্বল সোনালি রঙের টিসু শাড়ি পরা, পায়ে রুপোর মল। হাঁটা চলা করলে ঝমঝম বাজে। 'পায়েলিয়া মোরি বাজ রহি সখি ঝনঝন বোলে' জৌনপুরিতে মনে মনে গুনগুন করি। একটু অপ্রস্তুত লাগে। সবাই বললে, গান হোক। উঁচু পালংকে উঠে বসেছি, ঘর ভরতি লোক। অপরিচিতের সমাবেশ। মাত্রই তো দু-চারদিনের চেনা সকলের সঙ্গে। ফেলে আসা জীবনের জন্য মনের কোথায় একটা ব্যথা আছে। গলায় সোনার চিক, একটু দম বন্ধ লাগে। হাত দিয়ে একটু ঢিলে করে নিয়ে গান ধরি। গানের মতো আশ্চর্য জিনিস আর হয় না। চোখ বুজে গান ধরি অমনি পারিপার্শ্বিক সব লুপ্ত হয়ে যায়। অন্য কোনও এক অচেনা জগতে চলে যাই—

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা

আমি আর এ জগতে নেই, গান তো নয়, এ হল ঈশ্বরের আরাধনা—আজু বিধি মোহে অনুকূল হোঅল, টুটল সবহুঁ সন্দেহা।

ডাক্তার সাহেব

ধীরে ধীরে বাড়ি খালি হয়ে গেল। বিবাহ উপলক্ষে সমবেত আত্মীয় অভ্যাগতরা ফিরে গেলেন। উডবার্ন পার্কের বাড়ি খুব নীরব ও শান্ত হয়ে গেল। আমার একটু অস্বস্তি হত। অত বড় বড় ঘর, উঁচু সিলিং, কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে, যেন রূপকথার ঘুমন্ত পরী, অপেক্ষায় আছে কেউ যদি এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেয়।

আমার দৈনন্দিন জীবনধারা কিছু পালটে গেল। আমার রাত্রে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস। এ বাড়িতে রাত নটায় ডিনার খাবার পর সবাই জেগে ওঠে। খাবার টেবিলে হঠাৎ ঠিক হয় একটা সিনেমা দেখতে গেলে কেমন হয়। অমনি সবাই উঠে পড়ে চলে যাই মেট্রোতে বা গ্লোবে নাইট শোতে। ফিরে এসেও বেড সাইড লাইট জ্বালিয়ে বইটই পড়া হয়। আমার তো আরও মুশকিল আমার খাটের পাশে লেখার টেবিল, তার ওপর অলিভেত্তি টাইপরাইটার। শিশিরকুমার রাত জেগে কাজ করে চলেন খট্ খট্ খট্ খট্। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন লেখা, চিঠিপত্র, বক্তৃতা টাইপ করে প্রস্তুত করা হচ্ছে, বই প্রকাশ করা হবে, নয়তো কিছু দলিলপত্র, নেতাজি ভবনে আর্কাইভস তৈরি হচ্ছে সেখানে গুছিয়ে রাখা হবে।

আমার খুব সকালে ওঠা অভ্যাস। ছেলেবেলা থেকে বাবা-মার সঙ্গে লেকে মর্নিংওয়াক করতে যাই নয়তো গ্রীষ্মকালে সুইমিং। এ বাড়িতে অবধারিত ভাবে সকলে দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে। ভোরে উঠে শোবার ঘর থেকে বার হলে চোখে পড়ে বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য গুণী দালান ঝাঁটপাট দিচ্ছে। তবে হ্যাঁ রোজ সকালে বেশ সকাল সকাল কে যেন শোবার ঘরের দরজায় নক করে খট খট্। প্রথম একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শিশিরকুমার বললেন ভয় করো না, রয়াল বারবার আসে প্রতিদিন সকালে। রয়াল বারবার? সে আবার কী? সন্তোষনাপিত আসে প্রতি শোবার ঘরে নক করে, বাড়ির কর্তাদের দাড়ি কামিয়ে দিয়ে যায়। সন্তোষ হল সেকেন্ড জেনারেশন। ওর বাবা হরি ছিলেন সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের রয়াল বারবার। রোজ সকালে একই কাজে আসতেন।

সকাল আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে শিশু হাসপাতালে পৌঁছতে হয়

শিশিরকুমারকে। বেলা দুটো আড়াইটে হয়ে যায় কাজ শেষ করে ফিরতে। বিকেল পাঁচটা থেকে চেম্বারে রুগি। প্রথম দিকে ধর্মতলায় আলাদা চেম্বার ছিল শিশিরকুমার ও ডাক্তার ভগ্নিপতি শচীশ রায় পাশাপাশি বসতেন। তারপর আমরা যখন উডবার্ন পার্কের ছোটবাড়িতে বসবাস শুরু করলাম তখন সেই খেলনা বাড়িতে সিঁড়ির তলায় আর মেজানিন ফ্লোরে কোনওমতে চেম্বার করা হল। প্রথম জীবনে রুগির সংখ্যা হাতে গোনা। আমার একটু আশ্চর্য লাগে কারণ আমার শিশু চিকিৎসক কাকা ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর ব্যস্ততা অসম্ভব, দম ফেলার সময় পান না। আমি তাই দেখে অভ্যস্ত। টেলিফোন অসময়ে বাজলে সেজোকাকা ফোন তুলে ঘুম ঘুম গলায় প্রথমেই বলেন, ডাক্তার বাড়ি নেই। ওপার থেকে হয়তো শোনা গেল—আমি শিশির বলছি। ওহ্ তুমি? বলো কী ব্যাপার!

সেই প্রথম জীবনে একটার জায়গায় দুটো রুগি হলে খুব উৎফুল্ল হতাম। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে এমন সময় এল যখন রুগি সামলাতে পারি না। সেজোকাকার মতো 'ডাক্তার বাড়ি নেই' বলতে হয়। কাতর ভাবে বলতে হয় দেখুন অত তাড়াতাড়ি কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রফেশনের এই পর্যায়ে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়েছিল।

রবিবারের সকালে নেতাজি ভবনে চাইল্ড হেলথ সেন্টারে বিনা পারিশ্রমিকে রুগি দেখা। সেবামূলক কাজ কিছু করতেই হয় নেতাজি ভবনে। সে সময়ে এধরনের সেন্টার বেশি ছিল না কলকাতা শহরে। শুধু অসুখ করলে দেখা হবে তা নয়—সুস্থ শিশুর চেক আপ হবে, প্রতিরোধক ইনজেকশনের ব্যবস্থা হবে। শিশুচিকিৎসার ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করছে নেতাজি ভবনে চাইল্ড হেলথ সেন্টার।

শিশু চিকিৎসার পাঠ নিয়েছিলেন শিশিরকুমার ইংলন্ডে গ্রেট অরমনড স্ট্রিট হাসপাতালে। তারপর হাতে কলমে শিশুচিকিৎসার কাজ করলেন ভিয়েনা শহরে আর সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে। বিদেশে থাকার সময়ে পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসুর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ পান তিনি। শিশু চিকিৎসার পাঠ শেষ করে দেশে ফিরে এসে শুরু হয় নিজেকে ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

আমাদের বিয়ের পর দ্বিতীয়বার ডাক্তারি চিকিৎসার পাঠ নিতে গেলেন আমেরিকার বস্টন শহরে। সেখানকার শিশু হাসপাতাল বস্টন চিলড্রেনস মেডিকেল সেন্টার জগদ্‌বিখ্যাত। রকফেলার ফেলো হিসেবে তিনি যোগ দিলেন কাজে আর এই ফেলোশিপের সুবাদে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হলেন তিনি। সে সময়ে তিনি স্পেশালাইজ করেন শিশুদের রেডিওলজিতে। এই বিষয়ে ওঁর প্রফেসর ছিলেন ডাঃ নিউহাউসার যিনি এই

ব্যাপারে কিংবদন্তি স্বরূপ। ভারতবর্ষে পিডিয়াট্রিক রেডিওলজি তখনও অজানা। ডাঃ নিউহাউসার ঠাট্টা করে বলতেন শিশিরের পরিচয় হবে 'ফাদার অব পিডিয়াট্রিক রেডিওলজি ইন ইন্ডিয়া'।

আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর উডবার্ন পার্কের বাড়ির একতলা আমাদের বাসস্থান হয় আর এককালে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অফিস ঘর ছিল যে ঘর সেই ঘর শিশিরকুমারের চেম্বারে পরিণত হয়। সেইখানে ধীরে ধীরে ওর চিকিৎসা জগতে প্রতিষ্ঠা।

শিশিরকুমার ছোটদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অনেক সময় শিশুদের ডাক্তার ভীতি থাকে। কিন্তু শিশিরকুমার নিজের বিরাট সংখ্যক শিশু রুগিদের কাছেও একেবারে ভীতিজনক ছিলেন না। দার্জিলিঙের ম্যালে পূজার ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছি। কলকাতার সব বিশিষ্ট বা তত বিশিষ্ট নন মানুষজনে ম্যালে ভিড়, পুজোর প্যান্ডেলের মতোই ধাক্কাধাক্কি। সব বাচ্চারা দেখি 'আমার ডাক্তার, আমার ডাক্তার' বলে দৌড়ে এসে ওকে ধরছে, ভয় ভীতির চিহ্নমাত্র নেই। আর তাদের মায়েরাও মুগ্ধ বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাদের ডাক্তার সাহেবকে দেখছেন। মায়েদের সঙ্গে ওর আদানপ্রদান বা ইংরেজিতে যাকে বলে রাপোর্ট ছিল খুব সহজ ও সুন্দর। উনি বলতেন শিশুদের তো নয় মায়েদেরই চিকিৎসা করি। শিশুরা এমনিতেই ভাল থাকে। মা বা কখনও বাবারাও গোলমাল করেন। খাওয়া নিয়ে জোর করা ওঁর একদম অপছন্দ। খাচ্ছে না তো থাক, ক্ষিদে পেলে নিজে থেকে খাবে। ঠিকমতো বাড়ছে না, ইস্কুলে যেতে অনিচ্ছা, রহস্যময় পেট ব্যথা—এ সবেরই মূলে মা, বাবা বা ঠাকুমা দিদিমা কারও কর্মকাণ্ড। মায়েদের উনি অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতেন। উনি চাইতেন শিশুর ব্যাপারে মা অগ্রণী ভূমিকা নেবেন, সিদ্ধান্তও নেবেন। নিজের মা বা শাশুড়ির চাইতে নিজের উপর আস্থাশীল হবেন। পূর্ব প্রজন্মের ঠাকুমা দিদিমারা অনেক সময় কিছু পুরাতন বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতেন যেমন জ্বরের সময় ঠাণ্ডা স্পঞ্জ করলে নিউমোনিয়া হয়ে যাবে, দই খেলে ঠাণ্ডা লাগবে, ডিম খেলে পেট খারাপ হবে, অনেকদিন পর্যন্ত শিশুকে সলিড খাদ্য না দিয়ে দুধ খাইয়ে রাখা—ইত্যাকার নানা ধারণা।

দার্জিলিঙের ম্যালেও মায়েরা সুযোগ পেয়ে একটু জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছেন। কার বাচ্চার ঠাণ্ডা লেগেছে, কার যেন ডায়েরিয়া হয়েছে। শিশিরকুমারও ধৈর্য ধরে শুনে যাচ্ছেন। পথে ডাক্তারকে পেলে এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রবণতাকে আমার শিশু চিকিৎসক কাকা ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী বাঙাল ভাষায় বলতেন—'পথে পাইলাম কামার/দাও গড়াইলাম আমার।'

দার্জিলিঙের ম্যালে বেঞ্চে বসে আছি। দিলীপদা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার

পাশে এসে বসলেন। এই যে, দিলীপদা বললেন, এই যে কৃষ্ণা, তোমার কর্তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দাও তো, ছেলেটাকে একটু দেখাব।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করি—সে কী! অসুখ করেছে বুঝি?

দিলীপদা হেসে বললেন—দূর, অসুখ করতে যাবে কেন? আসলে বুঝেছ—এটা এখন একটা ইন থিং (in thing) একবার শিশির বোসকে বাচ্চা না দেখালে সোসাইটিতে প্রেস্টিজ থাকছে না।

কথাটা পরিহাসচ্ছলে বলা হলেও তার মধ্যে বাস্তব সত্য ছিল। একটা সময় এল যখন কলকাতা শহরে এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া ভার যেখানে শিশিরকুমারের শিশু রুগি এক আধজন অন্তত নেই। তার মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার, অবাঙালি ব্যবসায়ী, নামজাদা শিল্পপতি, কলকাতার বিদেশি দূতাবাস কে নেই।

এমন হয়েছে গভীর রাত্রে তদানীন্তন সোভিয়েট কনসুলেটের বিরাট গাড়ি এসে দাঁড়াল, ওকে তুলে নিয়ে গেল কোনও শিশুর বাড়াবাড়ি অসুখ চলছে তাকে দেখতে হবে। কখনও হয়তো বিকেলে চেম্বারে বসেছেন—মস্ত একটা ভ্যান চালিয়ে আমেরিকান কনসালের স্ত্রী এক দীর্ঘাঙ্গী মেমসাহেব হাজির হলেন, সঙ্গে গোটা পাঁচেক কচিকাঁচা, দুটি নিজস্ব বাকি সব অ্যাডপটেড, দত্তক নেওয়া। একজন ভিয়েতনামের, একজন আমেরিকারই কালো মানুষ, অন্যজন ভারতীয়। এদের উৎসাহ আছে বটে। আমেরিকানদের একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল ডাঃ শিশিরকুমার বসুর প্রতি। কারণ তারা জানত শিশিরকুমার বস্টনের বিখ্যাত শিশু হাসপাতালে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, আমেরিকার যে প্রান্তেই থাকুক না কেন কোনও শিশুর গভীর সংকট হলে বস্টন চিলড্রেনস মেডিকেল সেন্টারে ছুটে আসতেই হবে। আর সেই কোল্ড ওয়ারের যুগেও যেমন ডাক্তার হিসেবে ওর রাশিয়া ও আমেরিকায় সমান বিচরণ ছিল, দুই জার্মানিতেও তাই। যদিও পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিতে কলকাতার কনসুলেটেও বাক্যালাপ নেই তখন। পূর্ব জার্মানির এক কনসাল জেনারেলের রহস্যময় মৃত্যু হয়েছিল। শিশুদের দেখতেন বলে সেই কনসালের স্ত্রী ওকে ডাক্তার হিসেবে চিনতেন। ভোররাত্রে—খুব বিপদ বলে মহিলা ফোন করায় উনি ভেবেছেন বাচ্চাদের কিছু হয়েছে বুঝি। পৌঁছে দেখেন কনসাল জেনারেলের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে উঠোনে। ওর কিছু করার ছিল না—পুলিশ কমিশনারকে ঘটনা জানানো ছাড়া। তখন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়। উনিও ফোন করলেন। কী ব্যাপার জানতে। আত্মহত্যা না অন্য কিছু। খবরকাগজে হইচই হল দিনকতক।

রুগি দেখার সময়ে শিশিরকুমারের সব মনোযোগ থাকত শিশু রুগির

প্রতি—হয়তো শিশুর মা বা বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের একটু ঝাপসা ভাবে চিনতেন। কিন্তু রুগির পরিবারের সামাজিক স্টেটাস বা অন্য কোনও বিষয়ে উনি থাকতেন উদাসীন। তাই অনেক সময়ে উনি জানতেনও না যাদের বাড়ির শিশুকে দেখছেন তারা হয়তো কোনও না কোনও কারণে সমাজে খুবই সুপ্রতিষ্ঠিত বা খ্যাতনামা।

এই উদাসীনতার জন্য মাঝে মাঝে কোনও অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হত।

একবার এক বিশিষ্ট অবাঙালি শিল্পপতির ছেলের বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ হল। কেন নিমন্ত্রণ হল ভেবে আমি তো একটু আশ্চর্য হলাম। নিমন্ত্রণের দিন গিয়ে দেখি আমরা ছাড়া একমাত্র বাঙালি উপস্থিত—তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। উনিও আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—ও তোমরাও আছ, আমি তো ভাবলাম আমি একমাত্র বাঙালি।

বিয়ে বাড়িতে গিয়ে শিশিরকুমার বললেন—ও, অমুকের বিয়ে? ওকে তো ছেলেবেলা থেকে দেখেছি।

আর একবার এক তরুণ শিল্পপতিকে কী কারণে উনি 'ডিয়ার স্যার' বলে চিঠি লিখলেন। তার জবাব এল 'ডিয়ার শিশিরকাকা'। তখনও উনি বললেন, 'ও এই ছেলেটি তো সে—এখন তো ওর বাচ্চাদেরও দেখছি।'

অভিনয় জগতের অনেকে আসতেন পুত্র কন্যা নিয়ে—অভিনেতা, অভিনেত্রী, চিত্র পরিচালক।

গ্রাম বাংলাতে বা বাংলার বাইরেও ছড়ানো ছিল ওর ডাক্তার পরিচিতি। বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলা থেকে অনেকে আসতেন। জেলার মানুষেরা মাঝে মাঝে একটু বিভ্রান্ত হতেন। একজন শিশিরকুমার বসু ছোটদের ডাক্তার, একজন নেতাজির কর্মকাণ্ড নিয়ে থাকেন, আর একজন অন্তত কিছুকাল রাজনীতিক ও বিধায়ক—এরা কি তিনজন ভিন্ন লোক নাকি একজনই! সত্যিই ওর অনেকগুলো টুপি ছিল, অনেকগুলো হ্যাট। যে সময় উনি পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় চৌরঙ্গি কেন্দ্রের বিধায়ক তখন ফোন বাজলে আমার কনিষ্ঠ পুত্র তখন বালক—জিজ্ঞাসা করত "কার ফোন? রু না রা?" অর্থাৎ রুগি না রাজনীতি? দুটো প্রায়ই মিশে যেত—রুগির অভিভাবকেরা রাজনীতি করতে চান, কখনও বা রাজনীতিকরা রুগি দেখাতে চান।

বাড়ির ছোটদের উনি প্রিয় ছিলেন—কারও কাকা, কারও জেঠু, কারও মামা, কারও মেসো। বাড়ির শিশুদের প্রতি উনি একান্ত যত্নশীল ছিলেন, সকলের একান্ত ভরসা। আমার মেজো ভাশুরের ছেলে বুবু—একবার কঠিন অসুখ করল। উনি কাউকে না বলে সব রকম টেস্ট করিয়ে ডা. ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করে চিকিৎসা করলেন। অসুখের গুরুত্বের কথা বাবা

মাকে জানতেও দিলেন না। ওর বাবার কথা বলে বললেন নদা বড় নার্ভাস—ওকে বলে দরকার নেই। শিগগিরই সে ভাল হয়ে গেল।

বুবু বলতে গিয়ে মনে হল আমাদের বাড়িতে একটা রীতি ছিল। সব ছোট ছেলের নাম 'ব' দিয়ে শুরু—বুবলা, বাপ্পা, বুবাল, বুবু। আমার নবজাত শিশুর জন্য 'ব' দিয়ে নাম খুঁজে না-পাওয়াতে শিশিরকুমার ওকে 'বু' এক অক্ষর দিয়ে ডাকতেন। সবাই তাই 'বু' গ্রহণ করেছিল। পরে মুখে মুখে তা 'বুয়া'-তে পরিণত হয়। আরও পরে যেসব শিশুপুত্র পরিবারে এল তারাও ববি, বাবলা, বাপী, বুম্‌বা ইত্যাদি ব-যুক্ত ডাকনামে ভূষিত হল।

বাড়ির সব বাচ্চাদের চিকিৎসা উনি করতেন তবে ইনজেকশন দেওয়াতে একটু আপত্তি করতেন—'কেন যে আমাকে দিয়ে করাও—ওদের একটা ভীতি হয়ে যেতে পারে আমার সম্বন্ধে।' বাড়ির বাচ্চাদের প্রতিরোধক বা অন্য ইনজেকশন দেবার সময়ে আমার ভূমিকা ছিল পা চেপে ধরা। কারণ তাদের মায়েরা ভীত হতেন। পরে উনি যখন দ্বিতীয় প্রজন্ম অর্থাৎ পৌত্র-দৌহিত্র স্থানীয়দের দেখতে শুরু করলেন তখন আমি আর পা চেপে ধরব না বলে বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম।

অন্যদের দেখলেও নিজের ছেলে মেয়ের গুরুতর অসুখে উনি নিজে দেখতেন না। ওর সতীর্থ অন্য শিশু চিকিৎসককে ডাকতেন। বলতেন নিজের ছেলেমেয়ের চিকিৎসা করতে যাওয়া ঠিক নয়।

ওর চিকিৎসার বেশ একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। কিছুতেই কড়া ওষুধ দেবেন না। মায়েরা হয়তো ব্যস্ত হচ্ছেন—তাড়াতাড়ি সারিয়ে দিন, ইস্কুল কামাই হয়ে যাচ্ছে। উনি চলবেন, ধীরে সুস্থে। শিশুর খাওয়া-দাওয়ার চার্ট করবেন অত্যন্ত ভাবনা চিন্তা করে। শশা, ছানা, কলা কখন কী খাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার চার্ট পালটাবে। অনেক মায়েদের জানি যারা অত্যন্ত যত্ন করে এইসব চার্ট জমিয়ে রেখেছেন ফাইল করে। পরের ছেলেমেয়েদের বেলা কাজে লেগেছে, হয়তো পরের প্রজন্মের জন্যও কাজে লেগে যাবে। ওর নিজের শিশু চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে একটি বই লেখার জন্য অনেকে অনেকবার বলেছেন। মনে পড়ে গৌরদা—গৌরকিশোর ঘোষ প্রায়ই বলতেন—আপনি শিশু চিকিৎসার ওপর বই একটা লিখে দিন। সেটা হয়ে ওঠেনি। শেষ জীবনে কন্যা শর্মিলা কিছু লিখে রেখেছিল। শিশিরকুমার নিজের নাতিদের জন্য যা বলতেন সে সব নোট করে রেখেছিল। হয়তো ভবিষ্যতে কোনও কাজে লেগে যেতে পারে।

শেষের দিকে দেখতাম উনি অন্য অল্পবয়সী ডাক্তারদের চিকিৎসা পদ্ধতি পছন্দ করতেন না। হয়তো দু'একজন ডাক্তারকে দেখাবার পর ওর কাছে

এসেছে। প্রেসক্রিপশন দেখে ওর চক্ষুস্থির। আমাকে বলতেন—দেখো কাণ্ড ওষুধ লিখে দিয়েছে আধ ডজন। তৎক্ষণাৎ ওষুধ বন্ধ। হয়তো খাওয়াদাওয়ার একটু এদিক ওদিক, সামান্য ভিটামিন, কডলিভার ওয়েল—ব্যস। বলতেন অভিভাবকদেরও দোষ আছে, তাড়াতাড়ি ভাল করে দেবার জন্য ব্যাকুল।

দু' একটি বিশেষ ওষুধ সম্পর্কে ওকে বলতে শুনেছি—এ ওষুধ বড়দের পক্ষে ভাল কিন্তু বাচ্চাদের দিতে নেই। আজকালকার ডাক্তাররা অনেক সময় জানে না, দিয়ে ফেলে। তারপর যা প্রতিক্রিয়া হয় সামলাতে প্রাণ যায়। সময়ে এলে কিছু করা যায়—দেরি হয়ে গেলে কিছু করাও যায় না।

উনি চাইতেন মায়েরা আরও বেশি শিশু-স্বাস্থ্য সচেতন হোন। মাঝে মাঝে রাগ করে মায়েদের বলতেন, আজকাল কত পত্র-পত্রিকা বার হচ্ছে কতরকম খবরাখবর হচ্ছে, কত ডাক্তারদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়—পড়েন না কেন? তাহলেও তো অন্য অনেক ব্যাপারে শিক্ষা পেতে পারেন। ওর যে শিশু রুগিদের সুবাদে পরিচিতির বিস্তৃত পরিধি ছিল তার মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু ছিল কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। অর্থাৎ আমি টেলিফোন ধরতাম, অনেক সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিতাম, শিশুর অসুখের লম্বা ফিরিস্তি শুনতাম।

ডা. বসু চলে যাবার পরে এত অপরিচিত জনের টেলিফোন পেলাম, চিঠি পেলাম—অনেকে জানালেন—আমার ছেলেকে উনি বাঁচিয়েছিলেন। কেউ বললেন আমার সন্তানকে তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। একজন মায়ের চিঠি আমাকে খুব অভিভূত করেছিল। তার মেয়ে কোনও জন্মগত ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। জানা ছিল বহুদিন বাঁচবে না। তবুও মৃত্যুর হাত থেকে দীর্ঘদিন ওকে রাখতে পেরেছিলেন শিশিরকুমার। শেষপর্যন্ত সে মারা যায়। সেই কন্যাহারা জননীও আমাকে চিঠিতে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন।

কলকাতার ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ বা শিশু হাসপাতালের সঙ্গে উনি হাসপাতালের জন্মলগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। হাসপাতালের অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে উনি শক্তহাতে হাল ধরেছিলেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর উনি হাসপাতালের ডিরেক্টর পদে ছিলেন তারপর প্রেসিডেন্ট অব দ্য ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ হয়েছিলেন।

শিশিরকুমারের ভাগ্য এমন যে, যে-দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উনি বিশেষভাবেই জড়িত ছিলেন কলকাতার শিশু হাসপাতাল ও নেতাজি ভবনে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো দুটিকেই বেশ কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছিল।

আমাদের কন্যা বালিকা বয়সে তার বাবার একটা কার্টুন এঁকেছিল। একজন ন্যুব্জ দেহ মানুষ হেঁটে চলেছেন তার এক কাঁধে একটা বাড়ি—নাম ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ, অন্য কাঁধে আরও একটা তাতে লেখা নেতাজি ভবন। আর মাথার ওপর আরও একটা বাড়ি, বাড়ির নাম 'বসুন্ধরা', ইট কাঠ খসে খসে পড়ছে। এই তিনটি বোঝা মাথায় নিয়ে অনেক কষ্টে পারাপারের চেষ্টা করছেন শিশিরকুমার। খুবই প্রতীকী হয়েছিল এই কার্টুন।

উডবার্ন পার্কের বাড়ি যখন সরকার অধিগ্রহণ করল তখন আমরা আশ্রয়ের সন্ধানে। শিশিরকুমারের সব চাইতে অসুবিধা। অনেক দূরে চলে গেলে বাসযোগ্য সুন্দর বাড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু উনি থাকতে চান নেতাজি ভবনের কাছে। রোজ গভীর রাত্রি অবধি সেখানে কাজ করবেন কী করে! দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তার হিসেবে রুগি দেখতে বার হলে কখনও ছুটবেন উত্তর কলকাতা, কখনও বা দক্ষিণ। মাঝামাঝি কোথাও বাসস্থান খুঁজতে হয়। বাড়ির সন্ধানে বার হবার মতো ওঁর সময় কোথায়। গৃহত্যাগের দিন স্থির হয়ে গেছে কিন্তু উনি চলে গেলেন ফুজিয়ারার সঙ্গে ইমফলে।

কোনওমতে আপাতদৃষ্টিতে বাসের অযোগ্য একটি ভাঙাচোরা বাড়িতে আমরা ঠাঁই পেলাম। আমি নাম দিলাম বসুন্ধরা। যত ভাঙাচোরাই হোক দু-একটি পছন্দের দিকও রইল। ঠিকানা হল শরৎ বসু রোড, আমরা খুশি। দক্ষিণ খোলা, পিছনে পা-ফেলার মতো ছোট্ট এক টুকরো জায়গা। ভেবে দেখলে বাড়ি বাসযোগ্য কি না তা শুধু বাইরের চেহারায় ঠিক হয় না। বাসগৃহের মানুষেরা তাদের জীবনযাপন, সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন বাসযোগ্যতা। সেদিক থেকে আমরা ভাগ্যবান। ঘটনাবহুল জীবন কেটেছে বসুন্ধরা গৃহে। ছেলেমেয়েরা এখান থেকে পড়াশুনো শেষ করে দেশবিদেশে পাড়ি দিয়েছে, উচ্চশিক্ষার জন্য, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে জীবনে। আমার অধ্যাপনার জীবন, অধ্যক্ষ হবার অভিজ্ঞতা সবই এখানে। বাড়িতে সাহিত্যিকদের সমাবেশ, পি. ই. এন-এর বৈঠক, গানের জলসা, চিকিৎসক বন্ধুদের বাৎসরিক পুনর্মিলন উৎসব—সব কিছু নিয়ে মুখর বসুন্ধরার দিন। শিশিরকুমারের ডাক্তারি জীবন, স্বল্পস্থায়ী রাজনৈতিক জীবন যখন উনি চৌরঙ্গি কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের বিধায়ক সবই এই গৃহে। আমার লোকসভার সাংসদ জীবনের তিনটি কঠিন নির্বাচন এই বসুন্ধরা গৃহ থেকেই। সব মিলে সুখে দুঃখে কেটে গেল বেশ কিছুকাল এই গৃহে।

মাঝে মাঝেই তাই মনে পড়ে শর্মিলার আঁকা প্রতীকী সেই কার্টুন। শিশিরকুমার পারাপার হচ্ছেন সংগ্রামী জীবন—এক স্কন্ধে শিশু হাসপাতাল, অন্য স্কন্ধে নেতাজি ভবন, মাথার ওপর বসুন্ধরা।

শিশিরকুমার জীবনে অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। তরুণ বয়সে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে ছিলেন। লাহোর ফোর্টে যখন বন্দি জীবন তখন বেঁচে থাকার আশা নেই। যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে, সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত। অপরাধ রাজদ্রোহ।

পরিণত বয়সে লন্ডনে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। দিনের পর দিন সেন্ট চার্লস হসপিটালে পাশে বসে কাটিয়েছি।

মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে ১৯৯৯ সালে মুম্বাইর ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে কাটাতে হল বেশ কিছুদিন। আমি ও ছেলেমেয়েরা প্রাণের আশা করিনি। কিন্তু প্রতিবারই দেখেছি ওঁকে অবিচলিত ও শান্ত। কোথা থেকে এই শক্তি পেতেন জানি না। কারাগারে দুবার মৃত্যুর মুখোমুখি হবার কথা বলার সময়ে আমাকে বলেছিলেন—কোনওদিনও দুর্বল হয়ে হে ভগবান রক্ষা করো বলিনি মনে মনে। নিজের অন্তরের শক্তিতে শক্তিমান ছিলাম। লায়ালপুর জেলে থাকার সময়ে ফাঁসির আসামির পাশের সেলে ওঁর জায়গা হয়েছিল। বলতেন পাঁচিলের ওপাশে ফাঁসির মঞ্চ দেখা যেত। কানে আসত 'ইয়া আল্লা' বলে একটা ধ্বনি তারপরই ঝপাৎ করে একটা শব্দ।

আমাদের বিবাহের পরপর কোনও একদিন আমার হাতে নিজের হাত রেখে উনি বললেন—লাহোর ফোর্টের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। আমি একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালাম। লাহোর ফোর্টের স্মৃতি ওঁর কাছে তো খুবই যন্ত্রণাদায়ক, আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক! উনি ধীরে ধীরে বললেন—লাহোরে তখন খুব শীত, তিনদিকে খোলা খাঁচার মধ্যে দিন কাটে, ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট হয়। রোজ ভোরবেলা ভাঙা কাঁসার গেলাসে চা নিয়ে আসে। চা তো পানের অযোগ্য। তবু আশায় থাকতাম কখন চা আসবে। এলেই ওই ভাঙা কাঁসার গেলাস ঠাণ্ডা দু হাত দিয়ে ধরে বসে থাকতাম। মনে হত উষ্ণতায় ধীরে ধীরে রক্ত সঞ্চারিত হচ্ছে, ফিরে আসছে প্রাণের স্পন্দন।

নেতাজিকে নিয়ে

নেতাজি ভবনে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর জন্ম ও তারপর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা আমি আমার চোখের সামনে উন্মোচিত হতে দেখলাম। শিশিরকুমারের জীবন নেতাজি ভবনের সঙ্গে এমনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে আমার ক্ষুদ্র সংসার ও নেতাজি ভবনের মহৎ প্রতিষ্ঠান আলাদা করে দেখা সম্ভব ছিল না। একথা বলা যাবে না যে শিশিরকুমার সংসারের কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। কিন্তু ওঁর জীবনে প্রথম আনুগত্য ছিল নেতাজি ভবনের প্রতি, তারপর অন্য সব। আমরা সেই জীবনই মেনে নিয়েছিলাম। এর জন্য ক্ষোভ তো কোনও ছিলই না বরং এটাই স্বাভাবিক এবং গর্বেরও মনে হয়েছে। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতটুকু পারি সাহায্য করেছি। ছেলেমেয়েরা শিশুবয়স থেকে নেতাজি ভবনের সব কাজে সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত। তাদের জীবনও তাদের পিতৃদেবের কর্মধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তাদের জীবনও সেই শিশু বয়স থেকে নেতাজি ভবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে।

আমাদের কন্যা শর্মিলা—তখন কত বয়স—দুই হবে হয়তো—নেতাজি ভবনে সামিয়ানার নীচে চেয়ারে বসে আছে। নেতাজির জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। শর্মিলার হাতে উলটো করে ধরা অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম—সে আপন মনে বলে চলেছে—নেতাজি ভবন, গান হবে—নেতাজি ভবন গান হবে। বড় হয়ে যখন সে দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে বসেও গান করেছে বা নিজেও জন্মদিনের অনুষ্ঠানে সমবেত সজ্জনদের গান গেয়ে মুগ্ধ করেছে তখন আমার সেই ছেলেবেলার ছবিটা মনে পড়ত।

নেতাজি মিউজিয়াম ছবি টবি দিয়ে সাজাবার পর প্রথম ভিজিটর এলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তাঁকে ঘুরিয়ে মিউজিয়াম দেখাচ্ছেন শিশিরকুমার ও অন্যান্যরা। সুগত জওহরলালের পায়ে পায়ে ঘুরছে। চলতে একটু অসুবিধাই হচ্ছে, তবু একটু হেসে গাল টিপে দিয়ে—আবার চলছেন জওহরলাল। জওহরলালের একটা নিজস্ব চার্ম ছিল। বালক সুগত একটু আশ্চর্য হয়ে দেখছে।

সেই চার বছর বয়সে তার জীবনের লক্ষ্য ছিল সে বড় হয়ে রেলের

ইঞ্জিনের ড্রাইভার হবে। সেদিনের পর সে আমাকে জানাল সে আর ইঞ্জিনের ড্রাইভার হতে চায় না। কেন কী হল, কী হবে তাহলে? সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করল আমি প্রধানমন্ত্রী হব। তার এই লক্ষ্য বদল করা দেখে আমরা কৌতুকবোধ করেছিলাম।

এটা কৌতুকের ব্যাপার ছিল বটে কিন্তু তার জীবনে সে সত্যিই কী হবে তা এই নেতাজি ভবন সূত্রেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। খুব ছেলেবেলা থেকেই সে বলতে শুরু করেছিল আমি ইতিহাস নিয়ে পড়ব আমি ইতিহাস চর্চা করব। সেকালে বেশির ভাগ ছেলে সায়েন্স পড়ার দিকে যেতে চাইত। সেন্ট জেভিয়ার্সে ক্লাস ফাইভে পরীক্ষা নিয়ে বলে দেওয়া হত কে সায়েন্স স্ট্রিমে যাবে—পরীক্ষায় ভাল করলে তবেই সায়েন্সে যাওয়া যেত। সুগতকে সায়েন্স পড়তে মনোনীত করা হল। কিন্তু সে জেদ ধরে রইল হিউম্যানিটিজ পড়বে কারণ বড় হয়ে সে ইতিহাস পড়বে। নেতাজি ভবনে দু ধরনের মানুষ সে কাছে থেকে দেখেছিল। একদল, যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেন। অনেক বিপ্লবী, আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক অফিসার ও সৈনিক, সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খান, জাপানের জেনারেল ফুজিয়ারা কে নয়। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা পেয়েছিল যারা ইতিহাস লেখেন, দেশ বিদেশের ইতিহাসবিদ আসতেন নেতাজি ভবনে বিভিন্ন সেমিনারে আলোচনাতে তারা ভাগ নিতেন। মনে পড়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার ইতিহাসবিদ মিলোস্লাভ ক্রাসা একবার ওকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে অন্য নানা বিষয়েও ভাল কেরিয়ার করা যায়। কিন্তু খুব ফল হয়নি।

কনিষ্ঠ পুত্র সুমন্ত্রর একটা গল্প বলি। প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার বসেছে নেতাজি ভবনে। জার্মানি থেকে জাপান থেকে আমেরিকা থেকে অনেক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এসেছেন। কলকাতারও অনেক জ্ঞানীগুণী উপস্থিত। সকলেই আলোচনা করছে কে কী পেপার দেবে বা পড়বে। কোন সেশনে কী পেপার যাবে সব পরিকল্পনা চলছে। সুমন্ত্রর বয়স চার, খুবই উৎপাত করছে। সে বলে চলেছে আমিও একটা পেপার দেব। কেবলি কানের কাছে বলে চলেছে, বলা বাহুল্য কেউই পাত্তা দিচ্ছে না।

প্রথম অধিবেশনের শেষে উডবার্ন পার্কের বাড়ির পিছনের লনে লাঞ্চ খাওয়া হচ্ছে। তখনও তার আবদার চলছে। অধ্যাপক লিওনার্ড গর্ডন তাকে উডবার্ন পার্কের বাড়ির বারান্দায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে হাঁক দিলেন—অ্যাটেনশন—এখন সুমন্ত্র একটা পেপার পড়বে। সবাই ঘুরে তাকাল কী পেপার দিতে চাও?

চটপট উত্তর হল—মুঘল ডাইনাস্টি।

বেশ তাই হোক।

সে তখন গড়গড় করে বাবর থেকে বাহাদুর শাহ পর্যন্ত সব মুঘল সম্রাটদের নামের তালিকা পরপর বলে গেল। পেপার শেষ হতেই শ্রোতাদের মধ্য থেকে অধ্যাপক হীরেন চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা 'কোয়েশ্চেন' 'কোয়েশ্চেন' বলে হাত তুললেন।

বহুকাল পরে বোধহয় কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে সুমন্ত্র কোনও পেপার দেবার সময় অধ্যাপক গর্ডন সভাপতিত্ব করছিলেন। তাঁর সভাপতির ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সুমন্ত্র জীবনে প্রথম যে পেপার পড়েছিল— তাতেও উনি সভাপতি ছিলেন।

যে কথা বলছিলাম, আমার ক্ষুদ্র সংসার আর নেতাজি ভবনের মহৎ কর্মযজ্ঞ তার মাঝে সীমারেখা মাঝে মাঝেই অস্পষ্ট হয়ে যেত। আমার সৌভাগ্য এই যে আমার পরিবারের পরিধি ক্রমেই বৃহৎ হয়ে চলল। নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সহযোদ্ধা যাঁরা আমাদের গৃহে মাঝে মাঝেই অতিথি হয়ে এলেন তাঁরা আমাদের পরমাত্মীয় হয়ে পড়লেন। কর্নেল প্রেম সাহ্গল, কর্নেল গুরুবকস্ ধীল্ন, লক্ষ্মী সাহ্গল বা জানকী অথিনাহাপ্পন এরা অচিরে ছেলেমেয়েদের আঙ্কল প্রেম, আংকল ধীলন, আন্টি লক্ষ্মী, আন্টি জানকীতে পরিণত হলেন। এই বন্ধন সাধারণ আত্মীয়তার সম্পর্কের চাইতে দৃঢ়তর ছিল।

ষাটের দশকের গোড়া থেকে নেতাজির সকল সহকর্মীকে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সূত্রে একত্র করার প্রয়াস শিশিরকুমার শুরু করেছিলেন। লালকেল্লায় শাহনওয়াজ, ধীলন, সাহ্গল এর বিচারের পর থেকে দেশের মানুষের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের নিয়ে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল কালে তা স্তিমিত হয়ে যায়। দেশভাগ ও স্বাধীনতার পর এঁরা ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেন। দেশের মানুষ তাদের যেন ভুলেই গেল। শিশিরকুমার ঠিক করলেন এঁদের সকলের মুখ থেকে এঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করতে হবে। সমসাময়িক ইতিহাসের সোর্স মেটিরিয়াল বা প্রত্যক্ষ উপাদান হিসেবে এর মূল্য হবে অসীম।

প্রথম অতিথি যিনি উডবার্ন পার্কের গৃহে এলেন তাঁর নাম ভগতরাম তলোয়ার। ইনি পেশোয়ার থেকে কাবুল নেতাজির অন্তর্ধানে সঙ্গী ছিলেন। কলকাতা থেকে গোমো শিশিরকুমারের নিজস্ব কাহিনী ছিল। পেশোয়ারে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মিঞা আকবর শাহ্ যাঁর সঙ্গে যাত্রা শুরুর আগেই সুভাষচন্দ্র শিশিরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বহুদিন পর্যন্ত মিঞা আকবর শাহ্র কথা লিপিবদ্ধ করা যায়নি। তিনি পাকিস্তানে নৌশেরা অঞ্চলে থাকতেন। পাকিস্তান থেকে তাঁকে নিয়ে আসার চেষ্টা করে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম।

বহুদিন পর ইংলন্ডে আমাদের সঙ্গে তাঁর যখন দেখা হল তাঁর কাহিনীর টুকরো আমরা পেলাম। যেমন করে বিভিন্ন টুকরো দিয়ে জিগ স পাজল সাজায় তেমনি করে বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন কাহিনীর টুকরো দিয়ে দেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ধরে রাখার কাজ শুরু হল।

রহমৎ খান এই ছদ্মনামে ভগতরাম তলোয়ার নেতাজির সঙ্গী হয়েছিলেন পেশোয়ার থেকে আফগানিস্তানের কাবুল পর্যন্ত। কাবুলে নেতাজিকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করতে হয়েছিল। সেই কঠিন সময়ে ভগতরাম সঙ্গী ছিলেন।

আমরা জানি রাশিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামিল হওয়া মাত্র ভারতীয় কমুনিস্টদের কাছে এই যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সকলে রাতারাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপক্ষে ও ইংরেজদের পক্ষে হয়ে গিয়েছিলেন। ভগতরাম তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি কীর্তি কিষাণ পার্টির সদস্য ছিলেন। তাঁরও আনুগত্য বদল হয়েছিল। তিনি যে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলেন সে কথা আমাদের অজানা ছিল না।

ভগতরাম আসার আগে শিশিরকুমার আমাকে বলেছিলেন, পরে কী ঘটেছিল তা নিয়ে এখন ভাবব না। আমার কাজ পেশোয়ার-কাবুল যাত্রা ও কাবুলের দিনগুলি ওর কাছ থেকে লিপিবদ্ধ করা। আমি জানি আমরা সকলে ধরা পড়লাম জেলে গেলাম, অনেক অত্যাচার সহ্য করলাম কিন্তু ভগতরাম একদিনের জন্যও জেলে যায়নি। সে অন্যদিকে যোগ দিয়েছিল।

অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতার গভীরতা কতদূর তা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষ করে চেক ঐতিহাসিক মিলান হাউনার তার বইতে কিছু দলিল উদ্ধৃত করে দেখালেন একই সময়ে ভগতরাম রাশিয়া ও ইংরেজদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন অথচ সে কথা গোপন করে আগের মতোই জার্মানি ও জাপানে নেতাজির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। ফলে খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সব পরিকল্পনা শত্রু পক্ষের কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল এবং অন্তর্ধানের সঙ্গীরাও ধরা পড়েছিলেন ওই একজন বাদে আর সকলে।

সে যাই হোক না কেন আমাদের কাছে ভগতরাম যে ক'দিন রইলেন খুবই বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে ছিলেন। উনি ডাক্তারি করছেন, আমার অধ্যাপনা আছে, আর আছে শিশুপুত্র ও শিশুকন্যা। আমাদের সাধারণ বাঙালি বাড়িতে ডাল ভাত মাছের ঝোল খেয়ে শিশুদের সঙ্গে খেলা করে সময় কাটাতেন। সাধারণত একটু রাত্রে ছাড়া কাজে বসতে পারতাম না। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ওর চেম্বারে রাত্রে বসা হত, ভগতরাম বলে যেতেন শিশিরকুমার সরাসরি টাইপরাইটারে তুলে নিতেন। ভগতরামের ইংরেজি

দুর্বল ছিল। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প ইংরেজির সংশোধন করা ছাড়া উনি যেমন বলেছেন তেমনি লেখা হয়েছে সবকিছু। কাবুল বৃত্তান্ত লেখা হয়ে যাবার পর উনি বেশ কয়েকবার ভগতরামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তারপর কী হল? হোয়াট হ্যাপেনড দেন? তুমি কী করলে? আমার মনে আছে জবাবে ভগতরাম বলতেন আমি তো ট্র্যাইবাল অঞ্চলে চলে গিয়েছিলাম কেউ জানতে পারেনি।

একবার আন্তর্জাতিক নেতাজি সেমিনারে জার্মানি থেকে উইটজেল এসেছিলেন। উইটজেল শিশিরকুমারকে তিরস্কার করে বলেছিলেন তুমি জেনে শুনে এইরকম একজন লোককে কী করে নেমন্তন্ন করো। উইটজেল কাবুলে জার্মান দূতাবাসে কাজ করতেন যুদ্ধের সময়ে। ভগতরামের মাধ্যমে নেতাজির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল ওঁর কাজ। ভগতরামের বিশ্বাসঘাতকতা জার্মানদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়েছিল।

এস এ আয়ার ছিলেন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার মন্ত্রী। একাধিকবার তিনি আমাদের কাছে এসে থেকেছেন। দিনের পর দিন উডবার্ন পার্কের দক্ষিণের বারান্দায় বসে নেতাজির সঙ্গে অতিবাহিত করা স্মরণীয় দিনগুলির গল্প আমাদের কাছে করেছেন। তাঁর লেখা বই 'আনটু হিম এ উইটনেস' একটি অবিস্মরণীয় দলিল। তবু বইয়ে পড়া এক আর নিজের মুখে সেই কাহিনী বলছেন তা শোনা এক বিশেষ অভিজ্ঞতা।

একদিন কথা হয়েছিল ঘোর যুদ্ধের মধ্যে, নানান উত্থান পতন সত্ত্বেও নেতাজি সর্বদা ধীর স্থির অবিচলিত থাকতেন। কী করে এটা সম্ভব হত! আয়ার বলেছিলেন—নেতাজির মনের জোরের উৎস ছিল তার আধ্যাত্মিক বিশ্বাস—উনি কথাটা ব্যবহার করেছিলেন স্পিরিচুয়াল ফেথ। এটা কোনও বিশেষ ধর্ম আচরণ নয়, তার চেয়ে গভীরতর অনুভব। আয়ার বলেছিলেন, উনি বিশেষ কোনও আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন কি না আমাদের জানা নেই। শুনেছি ওঁর সঙ্গে একটি গীতা সবসময় থাকত। ভোরে উঠে কিছু করতেন কি না জানলে জানতে পারে তার একান্ত সেবক বা ভ্যালে কুন্দন সিং। আমরা ওঁকে সবসময়ে কাজের মধ্যে দেখেছি প্রশান্ত ও অবিচল। তবে হ্যাঁ সিঙ্গাপুরে মাঝে মধ্যে উনি রামকৃষ্ণ মিশনে চলে যেতেন। ইউনিফর্ম খুলে পট্টবস্ত্র পরে পূজার ঘরে বসতেন। পূজার ঘর থেকে বের হয়ে এলে দেখতাম সেই একই উজ্জ্বল, প্রশান্ত মুখের ছবি।

আয়ার-এর মতো চমৎকার মানুষ খুব কমই দেখা যায়। আচার ব্যবহারে ছিলেন নিতান্ত সহজ সরল। আমাদের সঙ্গে খেতে বসতেন। ওঁর প্রিয় খাবার ছিল ভাত, বেগুন পোড়া তার সঙ্গে টক দই।

এমনি করে নেতাজি ভবনে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোকে ঘিরে নেতাজির

সহযোগীদের আনাগোনা চলতেই থাকত। তখন নেতাজি অরেশন বলে বক্তৃতামালার আয়োজন হত। প্রতি বছর এরা কেউ না কেউ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। ২৩শে জানুয়ারি নেতাজির জন্মোৎসব ঘিরে প্রতি বছর স্বজন মিলন ও আনন্দ অনুষ্ঠান যেমন হত তেমনি ঐতিহাসিক দলিল লিপিবদ্ধ করাও চলত।

প্রতি তিনবছর অন্তর নেতাজি ভবনে আন্তর্জাতিক সেমিনার বসত। জাপান থেকে এসেছেন জেনারেল ফুজিয়ারা, জেনারেল ইসোডা, হাচিয়া আরও অন্যান্য সহযোগী। জার্মানি থেকে এলেন আলেকজান্ডার ওয়ার্থ, লোথার ফ্রাংক। একবার মনে পড়ে পাঁচ মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল। কারণ অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা থেকে ঐতিহাসিক গবেষক উপস্থিত ছিলেন।

এত বড় বড় সম্মেলন কী ভাবে যে ক্ষুদ্র, সীমিত ক্ষমতার মধ্যে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে হয়ে যেত ভাবলে আশ্চর্য লাগে। শিশিরকুমার এক একবার হঠাৎ একটা ঘোষণা করে বসতেন তারপর আমরা কীভাবে তাল সামলাব ভেবে পেতাম না। কিন্তু সর্বদা শেষরক্ষা হয়ে যেত। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে প্রথম আন্তর্জাতিক সেমিনার বসেছিল। আগের বছর নেতাজি জন্মদিনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শিশিরকুমার ঘোষণা করলেন আগামী বছরে এখানে জাপান থেকে জার্মানি থেকে নেতাজির সহযোগীরা আসবেন, আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে। হলও তাই। আসলে আমরা আকস্মিক ঘোষণা ভাবলেও আকস্মিকতা প্রকৃতপক্ষে ছিল না। নেতাজি ভবনের প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে তিল তিল করে গড়ে তোলা প্রস্তুতি থাকত। শিশিরকুমার নীরব কর্মী ছিলেন, কথা বেশি বলতেন না। নীরবে কাজ করে যেতেন। সেই কাজের ফল আমরা মাঝেমাঝে প্রত্যক্ষ করতাম। হয়তো বই প্রকাশ হল, ফিলম্ তৈরি হল, কণ্ঠস্বরের ক্যাসেট বার হল, নয়তো আলোচনা চক্র যেখানে নেতাজির সহযোগীরা উপস্থিত।

নেতাজি ভবন বাড়িটি সুভাষচন্দ্রের পিতৃদেব জানকীনাথ বসু তৈরি করেছিলেন। কটকে ইস্কুলের পড়াশুনো শেষ করার পর এই বাড়ি থেকে তরুণ সুভাষ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে যেতেন। এরপর গেলেন বিলেতে। আই সি এস ত্যাগ করে ফিরে এসে এই এলগিন রোডের বাড়ি থেকে আবার দেশের কাজ শুরু। মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু ১ নম্বর উডবার্ন পার্কের বাড়ি তৈরি করার পর সুভাষচন্দ্র অনেক সময় ও বাড়িতেও কাটিয়েছেন। বিশিষ্ট অতিথিরা এলে তাঁদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে রাখা হত। সর্বভারতীয় নেতারা এলেও উডবার্ন পার্কে অতিথি হতেন। মহাত্মা গান্ধী এসে থাকলেন, জওহরলাল থেকেছেন, থেকেছেন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তিনতলার ছাদে গান্ধিজীর প্রার্থনা সভা বসেছে, দোতলার বসবার ঘরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং।

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসু ভ্রাতৃদ্বয় তখন ভারতীয় রাজনীতির ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী নেতা। উডবার্ন পার্ক ও এলগিন রোডের বাড়ির উপর পুলিশকে নজর রাখতে হয় সর্বদা। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এই দুটি বাড়ির গুরুত্ব অসীম।

নেতাজি ভবন বাড়িটির একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মাত্রা আছে অন্য কারণে। এই বাড়ি থেকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি কাজ করেছেন। ওঁর ব্যবহৃত শোবার ঘর ও বসবার ঘর আজও সেইভাবে রক্ষিত আছে। এই বাড়ির ঐতিহাসিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পেল কারণ এই বাড়ি থেকেই তাঁর চমকপ্রদ অন্তর্ধান—১৬-১৭ জানুয়ারি ১৯৪১-এর রাত্রে। সেই অন্তর্ধানে তরুণ শিশিরকুমারের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। তিনি তখন মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র শিশিরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমার একটা কাজ করতে পারবে? কী কাজ? কোনও এক গোপন যাত্রায় তার সঙ্গী হতে হবে। গাড়ি চালিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে গোপন কোনও গন্তব্যে। এই ঘটনা শিশিরকুমারের জীবনে এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেল। সেই যে তিনি রাঙাকাকাবাবুর কাজ হাতে নিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই কাজ তিনি করে গেছেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি 'কাজ চলছে' বলে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সেই যে এক শীতের সকালে রাঙাকাকাবাবুর আহ্বানে কাজের শুরু—তিনি লিখেছিলেন সেই কাজ চলছে, চলবে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে শিশিরকুমার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে লিখেছেন। দেশ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমাকে ডেকে বললেন—শিশিরবাবুকে দিয়ে এই ঘটনার কথা সবিস্তারে লিখিয়ে দিতে হবে। উনি রাজি হলেন, লিখতে শুরুও করলেন। সেই সময়ে আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়ি সরকার ঐতিহাসিক গৃহ হিসেবে অধিগ্রহণ করলেন। আমরা শরৎ বসু রোডে একটি পুরনো খুবই জীর্ণ চেহারার বাড়িতে এসে উঠলাম। প্রথম দিকে খুবই অসুবিধার মধ্যে দিন কাটল। নীচের তলার দুটি ঘরে আমরা ঠাঁই পেলাম। ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেওয়া হল আমার পিতৃগৃহে। সেই প্রথম কলকাতায় অবিশ্রান্ত লোডশেডিং শুরু হল। স্তূপাকার ফার্নিচারের মাঝখানে আমাদের শ্বেতপাথরের টেবিলের এক পাশে একটু জায়গা করে হ্যারিকেনের আলোয় গভীর রাত্রে মহানিষ্ক্রমণ লেখা চলল। একবার উনি হতাশ হয়ে বললেন সাগরবাবুকে বলে দাও আমি বোধহয় লিখে উঠতে পারব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহানিষ্ক্রমণ দেশ-এ পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

সাধারণ পাঠকের কাছে বইটি যেমন প্রিয় হল অনেক সাহিত্যিকের অকুণ্ঠ প্রশংসাও লেখক পেলেন। সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ আমাকে বলেছিলেন ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়াও এই বইটির সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম। এর নিরাভরণ সৌন্দর্যই এর সাহিত্যগুণ। কোথাও কোনও নাটকীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা নেই, কোথাও কোনও অহংকার বোধ নেই।

শিশিরকুমার এই মহানিষ্ক্রমণ সুভাষচন্দ্রের জীবনের এক বিরাট পদক্ষেপ বলে মনে করতেন। যেদিন উনি এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বাইরে পা দিলেন সেইদিনই আজাদ হিন্দ আন্দোলনের শুরু হল বলা যায়। আর দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু থেকে রাষ্ট্রনেতা ও সমরনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুতে উত্তরণের সেই প্রথম ধাপ।

মহানিষ্ক্রমণের স্মৃতি এই নেতাজি ভবন গৃহটিকে এক বিশেষ ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, জাতির জন্য এই গৃহ সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরি ছিল।

প্রশ্ন হল, কে লইবে সে কার্যভার? শিশিরকুমার বলেছিলেন সেই কাজের ভার নিজের ওপর না-নিয়ে তার কোনও উপায় ছিল না। শিশিরকুমারের সত্তর বছরের জন্মদিন উপলক্ষে 'সাগ্নিক' নামে একটি প্রতিষ্ঠান শিশিরকুমারকে সংবর্ধনা দেবেন স্থির করেন। 'সাগ্নিক'-এর অধিকর্ত্রী ছিলেন মীরা সেন, নেতাজির একনিষ্ঠ ভক্ত এবং বহুদিন ধরে নেতাজি ভবনে শিশিরকুমারের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। মীরার মনে হত এই যে নেতাজির জীবন ও কর্ম বাঁচিয়ে রাখার জন্য শিশিরকুমার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তার জন্য দেশবাসীর পক্ষে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর দায় থাকে।

নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি আর শিশিরকুমারের জন্মদিন ২ ফেব্রুয়ারি। সে বছর অর্থাৎ ১৯৯০-এর ২৪ জানুয়ারি রবীন্দ্রসদনে সাগ্নিক আয়োজন করেছিল একটি সংবর্ধনা সভার। শিশিরকুমার বসুর কর্মজীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সংবর্ধনা। সেই সভায় শিশিরকুমার একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন নেতাজির কাজ করে যাবার জন্য তিনি তাঁর পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসু ও মা বিভাবতীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এ কাজ তাঁকে করতেই হত। শরৎচন্দ্র বসুর ভরসা ছিল যে শিশির এই কাজ করবে আর বিভাবতী তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলে গিয়েছিলেন তোমার জন্য অনেক কাজ রইল।

গৃহত্যাগের সময়ে যে 'ওয়ানডারার' গাড়িটি চালিয়ে শিশিরকুমার নেতাজিকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই গাড়িটি দিয়েই নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর জন্ম ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। ওয়ানডারার গাড়িটি শরৎচন্দ্র তাঁর

পুত্র শিশিরকুমারের নামে কিনেছিলেন। খুব অল্পবয়স থেকে শিশিরকুমার গাড়ি চালাতে ভালবাসতেন এবং ভাল গাড়ি চালাতেন।

আমাদের বিয়ের পর অনেকদিন পড়ে থাকা গাড়িটি কষ্ট করে সারিয়ে নেওয়া হয়েছিল। খুব ভাল সারানো যায়নি। তবুও সেই গাড়িতেই আমরা ঘুরতাম। বাড়িতে 'লালদার জ্যালোপি' নামে গাড়িটার পরিচয় ছিল। প্রায়ই রাস্তায় দেখা যেত আমরা স্বামী স্ত্রী আর কোলে শিশুপুত্র রাসবিহারী এভেনিউ ধরে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে চলেছি। তবুও ওয়ানডারার গাড়িটি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারকে চলমান রাখত।

ওয়ানডারার গাড়ির সঙ্গে যুক্ত হল ঠাকুমা বাসন্তী দেবীর দেওয়া দুটি অমূল্য উপহার। সুভাষচন্দ্রের লেখা এক গুচ্ছ চিঠি বাসন্তী দেবী শিশিরকুমারকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কপি করে আমাকে ফেরত দিয়ো। যখন আমরা দুজন ফেরত দিতে গেলাম উনি বললেন, দূর বোকা, সত্যি ফেরত চেয়েছি নাকি!

সেই চিঠির গোছা ও একটি মার্বেলের বুদ্ধমূর্তি উনি দিয়েছিলেন। বুদ্ধমূর্তি সুভাষচন্দ্র বর্মা থেকে এনেছিলেন যখন মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পান। লোকে বলে বুদ্ধমূর্তি ঘরে রাখতে নেই। অন্তত ঠাকুমা তাই বলেছিলেন সুভাষ তো এমনিতেই সংসারে উদাসীন, বুদ্ধ ঘরে থাকলে নাকি বিবাগী হয়ে যাবার ভয় আছে। সেই বুদ্ধ উনি নিয়ে চলে যান ও নিজের কাছে রাখেন। এখন এই সবই মিউজিয়ামে স্থান লাভ করল।

নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সদস্যরা সকলেই যার যার কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। নেতাজি ভবনের কাজ তাদের কাছে সেবা এবং কাজ করতে করতে এক ধরনের নেশাতে পরিণত হত। রিসার্চ ব্যুরোর ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করতেন শিশিরকুমার। প্রকৃতপক্ষে নিজের জীবিকার জন্য যে টুকু সময় ব্যয় না করলেই নয়, সেটুকু বাদে পুরো সময় ওর কাটত নেতাজিভবনে।

নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর প্রথম চেয়ারম্যান বা সভাপতি হয়েছিলেন ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার। তারপর সত্যরঞ্জন বক্সী। বেশ অনেকদিন সভাপতি ছিলেন এস এ আয়ার। যখন খুব শরীর খারাপ হল তখন ব্যস্ত হয়ে পড়তেন—আমি তোমাদের কোনও কাজে লাগতে পারছি না, আমি শুধু প্রে করছি, প্রার্থনা করছি তোমাদের সকলের জন্য। আয়ার-এর মৃত্যুর পর হলেন প্রেম সাহ্গল। প্রেম যাকে বলে খুব অ্যাকটিভ চেয়ারম্যান ছিলেন, শিশিরের কাজে খুব সুবিধা হত। প্রেম ছিলেন আমাদের খুব কাছের মানুষ, নিতান্ত আপনজন। উনি জানতেন আমি খুব নেতাজির জীবনের নানারকম খুঁটিনাটি গল্প শুনতে ভালবাসি। যখনি আসতেন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হাঁকডাক

পাড়তেন—কৃষ্ণা, আই হ্যাভ রিমেমবারড অ্যান অ্যানেকডোট—আমার একটা গল্প মনে পড়েছে—বলব? এক একবার এক একধরনের কাহিনী ওঁর ঝুলি থেকে বার হত। একবার বললেন—আমি তো অনেকদিন নেতাজির মিলিটারি সেক্রেটারি ছিলাম তারপর আমি বদলি হলাম ফ্রন্টে যাব, রণক্ষেত্রে যাব। নেতাজির কাছে গুডবাই বলতে গেলাম। স্যালুট করে দাঁড়ালাম। দেখি ওঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে, নেতাজি কাঁদছেন। এক সময়ে দেখলাম আমি আমার সুপ্রিম কম্যানডারের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি আর ব্যাকুলভাবে বলছি—স্যার, আপনি কাঁদবেন না, আমার কিছু হবে না, আমি ভাল থাকব।

প্রেম সাহগল-এর আকস্মিক মৃত্যু আমাদের কাজে বড় আঘাত হয়েছিল। এরপর চেয়ারম্যান-এর ভার নিলেন গুরুবক্স সিং ধীলন। তিনি আবেগপ্রবণ, নেতাজির কথায় তাঁর চোখে জল আসে। শিশিরকুমারের সব কাজে তাঁর ছিল আন্তরিক সমর্থন।

প্রকৃতপক্ষে আয়ার, প্রেম সাহ্গল, ধীলন, লক্ষ্মী সাহ্গল, জানকী, এঁরা সকলে বলতেন—'নেতাজি ভবনে শিশির যদি এই কাজ চালিয়ে না রাখত, এই প্রদীপটি জ্বালিয়ে না রাখত তা হলে আমাদের কথা দেশবাসী ভুলেই যেত। আমরা যারা নেতাজির সঙ্গে আজাদ হিন্দ আন্দোলনে ছিলাম, যুদ্ধ করেছিলাম, ব্রিটিশের হাতে বন্দি হয়েছিলাম কে আর আমাদের কথা মনে রাখত।'

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অবদানের কথা স্মরণে রাখার কোনও ব্যবস্থাই তখন ছিল না। দেশের স্বাধীনতা যখন এল তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির মূল্য তো দিতেই হয়। স্বাধীন ভারতের সরকার কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে নেতাজির স্মৃতির প্রতি উদাসীন ছিল। এমনও দিন গেছে যখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র একজন পার্সনা নন-গ্রাটা—যেন তিনি কেউ নন। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে তাঁর নাম শোনা যায় না। দেশের মানুষের অন্তরে নেতাজির জন্য এক বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসন পাতা আছে। কিন্তু সেই আবেগ ও ভালবাসাকে ধরে রাখা খুব কঠিন। আর জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি ক্ষণস্থায়ী।

অতএব শিশিরকুমার যে কাজে হাত দিলেন তা স্রোতের বিরুদ্ধে চলার মতোই কঠিন। কিন্তু উনি ছিলেন অদম্য। "হি উইল নট টেক 'নো' ফর অ্যান অ্যানসার"—ওর সম্পর্কে যথেষ্ট বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভারত সরকারের কোনও সেক্রেটারি এই মন্তব্য করেছিলেন। কী নিয়ে যেন কিছুদিন চিঠিপত্র টেলিফোন আলাপ চলছিল। সরকার 'হবে না' বলে দিয়েছিলেন। শিশিরকুমার তা মানবেন না—'হবে' করবার চেষ্টা করছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য।

আমরা আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর ১৯৬০ সালের গোড়ায় নেতাজি ভবনের তিনতলায় মোটের উপর ছবি ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে মিউজিয়াম সাজিয়ে তোলা হল। নীচের দুটি ঘর নেতাজির শোবার ঘর ও বসবার ঘর আগে থেকেই যেমন ছিল তেমন সংরক্ষণ করা ছিল। আমার চোখে ভাসছে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে দেওয়ালে পেরেক ঠুকছেন হাতুড়ি দিয়ে—রিসার্চ ব্যুরোর ডিরেক্টর শিশিরকুমার বসু, পাশে আরও পেরেক, হাতুড়ি যন্ত্রপাতি নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে নেতাজি ভবনের বিশ্বস্ত কর্মী নগসুন্দরম। ছবিগুলো কোথায় কীভাবে লাগবে ঠিক করে দেবার পর এবার চেয়ারের ওপর আসীন নগসুন্দরম আর নীচে জোগানদারের ভূমিকায় শিশিরকুমার।

কাজের লোক অনেক কোনওদিনই ছিল না, রাখবার ক্ষমতাও ছিল না। অল্প ক'জনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের পরিশ্রমে তিল তিল করে গড়ে ওঠা সব কিছু।

নগসুন্দরমকে আমি প্রথম দেখেছিলাম আমার বিয়ের দিনের সকালে গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল এই তামিল যুবক। পরে ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। সে ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের এক সৈনিক। ফিল্ড পাবলিসিটি ডিভিশনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সে ইমফলের যুদ্ধের সময় সীমানা পার হয়ে ময়রাং পৌঁছেছিল। বহুদিন পর আমরা যখন নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর দলবল নিয়ে ইমফলে যাই সুন্দরম আমাকে দেখিয়েছিল মোরে-টামু সীমান্তে একটি ব্রিজের পাশে কোথায় তারা তাঁবু খাটিয়ে দিনের পর দিন ছিল। রিট্রিটের ঠিক আগে খুব তখন কষ্ট, ঘাস সেদ্ধ করে খাওয়া হয়। বিছানার মশারি নদীর জলে ফেলে মাঝে মাঝে কুচো মাছ পাওয়া যায়, ঘাস সেদ্ধর সঙ্গে মন্দ লাগে না।

যুদ্ধের পর, লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের পর আরও অনেক সৈনিক কলকাতায় এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেককে নেতাজি ভবনে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। কালে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। কিন্তু সুন্দরম-এর আর ফেরা হয়নি। সে নেতাজি ভবনের বিশ্বস্ত সেবক হয়ে রয়ে গেল। নেতাজির ব্যবহৃত জিনিসপত্র ছবি, দলিল, ফিলম্ এসবই সুন্দরমের হাতে গচ্ছিত রাখা হত। সে যক্ষের ধনের মতো সব কিছু রক্ষা করত। শিশিরকুমারের প্রতি তার শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। নেতাজি ভবনের প্রতিটি কাজে সে ছিল শিশিরকুমারের একান্ত সহায়।

ছেলেমেয়েদের কাছে সুন্দরম ছিল আপনজন। সুন্দরম ওদেরও পারলে যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখত। বড় হবার পর সুন্দরমদাদার সঙ্গে ছেলেবেলা কাটানোর গল্প নিয়ে তারা হাস্য পরিহাস করত। উডবার্ন পার্ক থেকে নেতাজি ভবন যেতে হলে রাস্তা পার হতে হয়। সুন্দরম শক্ত করে হাত

ধরে রাস্তা পার করবে। গাড়িতে তাদের কোথাও নিতে হলে ভিতরে ঢুকিয়ে গাড়ির দরজা লক্ করে আবার দুবার টেনে দেখবে ঠিক মতো দরজা লক্ হল কিনা।

নেতাজি ভবনের কোথায় কী আছে সুন্দরমের মাথায় কম্পিউটারের মতো গ্রথিত আছে সব। "সুন্দরম ১৯১২ সালে নেতাজির লেখা এই চিঠিটা কোথায় আছে বার করো তো", ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশন-এর ছবিটা এখুনি দরকার শিগগির দাও"—সুন্দরম মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু হাজির করে ফেলবে।

চল্লিশ বছর ধরে নেতাজি ভবনের একনিষ্ঠ সেবা করার পর ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে নগসুন্দরম আমাদের ছেড়ে চলে যায়। আমি সেদিন দিল্লি থেকে মরক্কো রওনা হয়ে যাচ্ছি, স্পিকারের সঙ্গে মরক্কো যাব ঠিক ছিল। সুন্দরমকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে রেখে এসেছি কিন্তু সে ভাল হয়ে উঠছে, শিগগিরই ছাড়া পাবে। প্লেন ধরবার জন্য বিমানবন্দরে রওনা হবার আগে ভাবলাম একবার কলকাতায় ফোন করি। তখনি দুঃসংবাদ পেলাম। আমি শিশিরকুমারের জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এই চলে যাওয়া ওকে গভীরভাবে ব্যথিত করবে জানতাম। টেলিফোনে শিশিরকুমার চিরদিনের মতো ধীর স্থির হয়েই কথা বললেন। বললেন সুন্দরমের ছেলে রাজন এসেছে, খুব কান্নাকাটি করছে। আমি তাকে বলেছি, "ডু নট উইপ, ইউ শুড বি প্রাউড অব ইয়োর ফাদার—কেঁদো না, তোমার বাবার জন্য গর্বিত বোধ করো।"

শিশিরকুমারের বলা এই বাক্যটি দু বছর পরে আমি আমার নিজের ছেলেমেয়েদের মনে করিয়ে দিয়েছিলাম—যখন তারা সদ্য পিতৃহারা।

১৯৬৫ সালে শিশিরকুমার জাপান গেলেন। যখনি যা সুযোগ পেতেন নেতাজির কাজের জন্য পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন। এই জাপান যাত্রার ফলে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর আর্কাইভস জাপান থেকে পাওয়া নানান দলিলপত্র, ছবি, ফিলমে সমৃদ্ধতর হয়েছিল। তিন সপ্তাহ উনি জাপানে ছিলেন। আমার মনে পড়ে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। আমাদের দশ বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম আমরা পরস্পরকে ছেড়ে থাকলাম। লোকে শুনলে হাসবে, কী-ই বা করা। প্রায় প্রতিদিন চিঠি আসত, আমার কাছে, ছেলেমেয়ের কাছে। সব চিঠিতেই নেতাজির কথা। যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে নেতাজির সহযোদ্ধাদের সঙ্গে—জেনারেল ফুজিয়ারা, জেনারেল কাটাকুরা, জেনারেল আরিসুয়ে ও আরও অনেকের সঙ্গে। রাঙাকাকাবাবুর প্রবাসের কর্মস্থল দেখতে পেরে এবং বিদেশি সহযোগীদের সঙ্গে দেখা হয়ে ওঁর যে খুবই ভাল লাগছে প্রতি চিঠিতে তা বুঝতে পারতাম।

জাপানি বন্ধুরা ওকে নিয়ে যাচ্ছেন নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত নানান জায়গায়। ইমপিরিয়াল হোটেল যেখানে উনি উঠেছিলেন। ওঁরা নিয়ে গেলেন রেনকোজি মন্দিরে যেখানে রক্ষিত আছে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের দেহাবশেষ। তখনও মন্দিরের প্রবীণ পুরোহিত মোচিজুকি আছেন। তিনি বললেন তুমি কি চাও এই ভস্মাধার খুলে আমি তোমাকে দেখাব? উনি বললেন, হ্যাঁ।

এই আধার খুলতে হলে যে সব আচার পালন করতে হয় পরদিন সারাদিন পুজো ও সেই সব আচার পালন করলেন পুরোহিত। জাপানি সাংবাদিক বন্ধু ইয়োকোবরি ওকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় মন্দিরে গেলেন। ইয়োকোবরির কথা মতো ফুল ও ফল নিয়ে গেলেন পুজোয় উৎসর্গ করার জন্য। পরিশেষে আধার খুলে দিলেন উনি। মোচিজুকি বলেছিলেন, তুমি হলে দ্বিতীয় যার জন্য আমি এই আধার উন্মুক্ত করলাম। প্রথম জন কে ছিলেন প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন, তোমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। শিশিরকুমার আমাকে বলেছিলেন, আমরা চিতাভস্ম বলি কিন্তু এ তো শুধু ভস্ম নয় বলা উচিত দেহাবশেষ।

সেবার উনি ফিরবার পথে তাইপে গেলেন। তাইপে বা তাইহোকুর সঙ্গে তখনও আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। ১৯৫৬ সালে নেতাজির বিমান দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য যে শাহ্‌নওয়াজ কমিটি বসেছিল তারাও তাইপে যায়নি। অথচ দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা তো জরুরি ছিল। বহুদিন পর আমি কমিশনের সেক্রেটারি শংকর মিত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন ওঁরা তাইপে গেলেন না। উনি বলেছিলেন, জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন ওদের সঙ্গে ডিপ্লোমেটিক রিলেশন নেই। তা ছাড়া একটা আশঙ্কা ছিল চিনদেশ এটা ভাল চোখে দেখবে না। আমাদের তখন হিন্দি-চিনি ভাই ভাই যুগ চলছে।

শিশিরকুমার একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাইপে চলে গেলেন। উনি সেই বিমানবন্দর, যেখানে বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলা হয়, সে হাসপাতাল যেখানে চিকিৎসার জন্য নেতাজি ও হবিবুর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সবই দেখে আসেন। আমি অনেক পরে যে বার ওঁর সঙ্গে তাইপে যাই কিছু কিছু দ্রষ্টব্য দেখতে পাইনি। যেমন উনি ক্রিমেটিরিয়াম, যেখানে শেষকৃত্য হয়েছিল বলা হয় দেখেছিলেন। আমি যখন যাই সেটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। উনি শাহনওয়াজ কমিশনের রিপোর্ট, হারীন শাহ-র লেখা বই হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখেছিলেন। এইবারের ভ্রমণে রেনকোজি মন্দিরে যাওয়া ও তাইপে ঘুরে আসা শিশিরকুমারের মনে একটা মানসিক তোলপাড় বা ইমোশনাল আপহিভেল সৃষ্টি করেছিল তা বুঝতে পারতাম। একদিক থেকে নিজের চোখে সব দেখে আসা যেমন জরুরি তেমনই সে সব দিনের কথা আলোচনা ওর

পক্ষে দুঃখদায়ক ছিল।

নেতাজি ভবনের সূত্রে দেশবিদেশে বহু লোকের সঙ্গে শিশিরকুমার যোগাযোগ করেছিলেন। কখনও চিঠিপত্রের মাধ্যমে কখনও সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। একবার এই পরিচয় হলে শিশিরকুমার সেই পরিচয়—সযত্নে রক্ষা করতেন। নেতাজিকে নিয়ে কোনও নতুন ঘটনা ঘটলে কোনও কিছু আবিষ্কৃত হলে সাধারণত একটা তাৎক্ষণিক হইচই সৃষ্টি হয়, তারপর লোকে আবার সব ভুলে যায়। শিশিরকুমারের কর্মপদ্ধতিতে 'হুজুগ' ব্যাপারটার কোনও স্থান ছিল না। এই যে উনি জাপান ও তাইপে থেকে ফিরলেন এ সব নিয়ে কোনও মাতামাতি হল না, কোনও সাংবাদিক সম্মেলন নয়। যে সব নতুন তথ্য দলিল পাওয়া গেল সব রিসার্চ ব্যুরোর আর্কাইভস-এ রক্ষিত হল। ওঁর জাপানের অভিজ্ঞতা আমি ছাড়া অল্প ক'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, রিসার্চ ব্যুরোর সদস্য এঁরা জানলেন। জাপানের সঙ্গে এই সংযোগ স্থাপন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল আর এই সংযোগের প্রত্যক্ষ ফল হল জেনারেল ফুজিয়ারার কলকাতা আগমন ও নেতাজির তরবারি নেতাজি মিউজিয়ামে প্রত্যার্পণ।

নেতাজি ভবনের প্রাঙ্গণে মুক্ত আকাশের নীচে ১৯৬৭ সালে এক সন্ধ্যায় সুন্দর অনুষ্ঠান হল। তখনকার গভর্নর পদ্মজা নাইডু সুন্দর ইংরেজিতে সুললিত ভাষণ দিলেন। ফুজিয়ারা জাপানি ভাষায় বললেন সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ হল। নেতাজির 'সোর্ড' বা তরবারি জেনারেল ফুজিয়ারা আনুষ্ঠানিকভাবে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর ডিরেক্টর ডাঃ শিশিরকুমার বসুর হাতে তুলে দিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভারতীয় ও জাপানি জাতীয় সংগীত গেয়েছিল। জাপানি জাতীয় সংগীত "কি মি গাওয়া" সুগত ও শর্মিলার মুখে শুনে ফুজিয়ারা চমৎকৃত হয়েছিলেন।

এই 'সোর্ড সেরিমনি' বা তরবারি উৎসব সারা ভারতে খুব প্রচার পেয়েছিল। দিল্লি থেকে অনুরোধ হল কিছুদিনের জন্য তরবারি দিল্লিতে প্রদর্শন করা হোক। শিশিরকুমার শর্ত দিলেন—এক, স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে নিতে হবে, দুই, যে কদিন রাখা হবে লালকেল্লাতে রাখতে হবে, তিন, রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক ভাবে অভ্যর্থনা জানাবেন। প্রভূত আলাপ আলোচনার পর স্পেশ্যাল ট্রেনে তরবারি দিল্লিতে গেল। শিশিরকুমার সঙ্গীসাথীকে নিয়ে সেই ট্রেনে গেলেন। শুনেছি প্রতি স্টেশনে লোকে ভিড় করে এসেছে। ট্রেন যাত্রীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের গান "হম্ দেহলি দেহলি যায়েঙ্গে, হম্ আপনে হিন্দ্ বানায়েঙ্গে" গাইতে গাইতে গিয়েছিলেন। বালক সুগত ভাল গাইতে পারত। সুগতর সঙ্গে সমর গুহ থেকে শুরু করে সকল নবীন, প্রবীণ যাত্রী গলা মিলিয়েছিলেন। দিল্লি পৌঁছতে পৌঁছতে সকলেরই গলা ভেঙে গিয়েছিল।

এই তরবারির ইতিহাসটি খুবই কৌতূহলপ্রদ। জাপানের কোনও প্রবীণ সেনাধ্যক্ষের চোখে পড়ল এক 'কিউরিও' শপ্ বা দোকানে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এই তরবারি তাতে একদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নাম খোদাই করা আছে—অন্যদিকে জাপানি ভাষায় লেখা আছে—"দুষ্টের দমন করো আর শিষ্টের পালন"—

অনেকেই জানত টোকিওতে নেতাজিকে একটি তরবারি উপহার দেওয়া হয়েছিল। উন্মুক্ত সেই তরবারি হাতে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ফটোগ্রাফও আছে। তরবারি জাপানিদের কাছে খুবই পবিত্র, এ হল প্রতীক শৌর্য, বীরত্ব ও বিপন্নকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি। টোকিও ছেড়ে আসার সময় অনেক জিনিসপত্র নেতাজি বিভিন্ন জায়গায় রেখে এসেছিলেন—যেমন শিবুসাওয়া পরিবার আমাদের বলেছিলেন তাদের কাছে অনেক কিছু রাখা ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে এসব সে দেশে যাবে এই ছিল নেতাজির নির্দেশ। যুদ্ধে পরাজিত, বিধ্বস্ত টোকিওতে সে সব কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল কেউ জানে না। প্রবীণ জাপানি সেনাধ্যক্ষরা একসঙ্গে হয়ে নিজেরা টাকা তুলে কিউরিও শপ থেকে তরবারিটি উদ্ধার করলেন ও তারপর নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর কাজ দিনে দিনে বেড়েই চলল। অনেক বিদেশি সহযোগীদের আসা-যাওয়া চলতে থাকল। একবার জানুয়ারিতে জন্মদিনের বক্তৃতা দিতে এলেন শ্রীমতী কিটি কুর্টি। কিটি চেকোশ্লোভাকিয়ার মেয়ে। নেতাজির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ত্রিশের দশকে বার্লিনে। ওর সঙ্গে শিশিরকুমারের পত্রালাপ চলছিল কিছুদিন। কুর্টি পরিবার তখন থাকেন আমেরিকায়। 'সুভাষচন্দ্রকে যেমন দেখেছি' বলে একটি সুন্দর বই লিখেছেন। শিশিরকুমার কলকাতায় প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বলে বইটি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। রিসার্চ ব্যুরোর আমন্ত্রণে ১৯৭০-এর জানুয়ারিতে নেতাজি অরেশন দিলেন কিটি কুর্টি। নেতাজির একজন চেক বান্ধবী ও গুণমুগ্ধ নেতাজির ওপর বক্তৃতা করছেন এতে কলকাতায় যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল।

এরপর এলেন জার্মানি থেকে আলেকজান্ডার ওয়ার্থ। যুদ্ধের সময়ে হিটলারের জার্মানিতে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতবর্ষ সম্পর্কে ডেসকে অ্যাডাম ফন ট্রটের সঙ্গে কাজ করতেন আলেকজান্ডার ওয়ার্থ। আমরা জানি হিটলারের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য নেতাজি পাননি। কিন্তু ইন্ডিয়া ডেসক-এর ভারপ্রাপ্ত অ্যাডাম ফন ট্রট, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ ও অন্যান্যরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং যথাসাধ্য করতে চেষ্টা করতেন। অ্যাডাম ফন

ট্রট হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার দায়ে পরে ধরা পড়েন ও মৃত্যুদণ্ড পান। আলেকজান্ডার ওয়ার্থও বই লিখেছেন নেতাজির সম্পর্কে।

বেশ কিছুদিন আমাদের সঙ্গে কলকাতায় কাটালেন লোথার ফ্রাংক, আর এক জার্মান সহযোগী। তিনি রিসার্চ ব্যুরোতে পড়াশুনো করতেন, আলেকজান্ডার ওয়ার্থের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমাদেরও খুব বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন।

আরও নেতাজি

১৯৭১ সালটা দেশের পক্ষে যেমন গুরুত্বপূর্ণ নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর পক্ষেও তেমন। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে নেতাজি ভবনে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যর জন্য ঘাঁটি তৈরি হল। বীণা দাসের নেতৃত্বে আমরা মেয়েরা সেখানে রোজ কাজ করতাম। রাত্রে কারফিউ জারি হল কদিন। অন্ধকারে কাজ চলত। হঠাৎ হয়তো খবর এল যশোর ফল করেছে, পতন হয়েছে যশোরের। অমনি অন্ধকারে এক রাউন্ড সন্দেশ খাওয়া হল। তারপরই হতাশা—নাঃ খবরটা নাকি সত্যি ছিল না। নেতাজি ফিলড হাসপাতাল নামে বনগাঁ সীমান্তে হাসপাতাল খোলা হল। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে চিকিৎসার জন্য আনা হত। শিশিরকুমারের সঙ্গে আমিও সেখানে গিয়েছি। বেশ কয়েকজন ডাক্তার বিশেষ করে সার্জন খুব ভাল কাজ করেছিলেন।

কলকাতায় তখন ছিল পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশন। হাইকমিশনার স্বয়ং এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আমাদের বেশ সখ্য ছিল। তাঁরা নেতাজির জন্মদিনে নেতাজি ভবনে আসতেন।

আমাদের উডবার্ন পার্কের বাড়িতে ডিনার খেতেন। আমি একটু অবাক হয়ে দেখতাম ডিনারের পর হয়তো গান হচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ধনধান্য পুষ্পভরা বা বঙ্গ আমার জননী আমার গান ধরেছে। ওঁরাও গানে গলা মেলাচ্ছেন, ওঁদেরও চোখ সজল হয়ে উঠেছে। সেই ছেলেবেলায় সুগত ও শর্মিলার একটি প্রিয় গান ছিল—শুনো রে শুনো দেশকে হিন্দু মুসলমান/শুনো বহেন, ভাই শুনো, শুনো নওজওয়ান/ এ সুভাষ-কি কথা, ইসমে হ্যায় বড়ি ব্যাথা/ইসমে কোই আগ্ হ্যায় আর কোই তুফান...। এই গান ওদের মন যেন বিশেষভাবে স্পর্শ করত।

যেদিন ৭ মার্চ ঢাকায় গোলযোগ শুরু হল সেদিন ঘটনাচক্রে আমাদের পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনে নেমন্তন্ন। সকালে খবর কাগজ পড়ে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। শিশিরকুমার বললেন, কী করা যায় বলো তো? ওরা তো ক্যানসেল করে কিছু জানাল না। শেষ পর্যন্ত আমরা মনে দ্বিধা নিয়ে ডিনার খেতে হাজির হলাম। সে সন্ধ্যার কথা কখনও ভুলব না। টেবিলে বসে হাই কমিশনার স্বয়ং, তা ছাড়া আনোয়াল উল করিম ও অন্যান্যরা যেন মনের

ভিতর বহুদিনের বন্ধ দরজার আগল খুলে প্রাণ খুলে কথা বলতে লাগলেন। অনেকের মনে দুশ্চিন্তা, বিশেষ করে মেয়েরা উদ্বিগ্ন—ঢাকা-খুলনা-যশোরে রয়েছেন আত্মীয় পরিজন। মিলিটারিরা বিপ্লব দমন করতে নেমেছে, কার ভাগ্যে কী হয়েছে কেউ জানে না। এরই কদিন পরে, একদিন সার্কাস অ্যাভিনিউর পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনের চূড়া থেকে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ নামিয়ে নেওয়া হল। আর পতপত করে উড়তে লাগল গাঢ় সবুজের ও লাল গোলক—নবজাত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পতাকা। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি ও শিশিরকুমার অন্যান্যদের সঙ্গে সার্কাস অ্যাভিনিউর বাড়ির প্রাঙ্গনে দাঁড়ানো। কে যেন আমার হাতে এক ফুলের তোড়া ধরিয়ে দিল। আমি হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে দিলাম বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারের হাতে।

ডিসেম্বরে বাংলাদেশ যুদ্ধ থামল। ১৯৭২ জানুয়ারির গোড়ায় শিশিরকুমার অ্যামবুলেনস্ চালিয়ে নিয়ে চলে গেলেন ঢাকায়। সঙ্গে ছিলেন নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ও মেডিকেল কলেজে ওঁর সহপাঠী অতুল সেন। ১০ জানুয়ারি মুজিবর রহমান মুক্তি পেয়েছেন। ১৬ জানুয়ারি ঢাকায়, শিশিরকুমারের সঙ্গে ওঁর দেখা হল। উনি আলিঙ্গন করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। মুজিব বললেন তাঁর রাজনীতিতে হাতে খড়ি সুভাষচন্দ্রের মাধ্যমে। উনি নেতাজির নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে প্রথম পথে নেমেছিলেন। শিশিরকুমারকে জড়িয়ে ধরে উনি বিশেষভাবে স্মরণ করলেন ওঁর পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসুর কথা। শরৎচন্দ্র বাংলাকে অখণ্ড রাখার প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন সে কথাও স্মরণ করলেন। সে বছর ২৩ জানুয়ারি তিনি নেতাজিভবনে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আসা সম্ভব না-হওয়াতে তিনি নেতাজির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক বার্তা টেপ-এ নেতাজি ভবনে পাঠান। ১৯৭২-এর ২৩ জানুয়ারি মুজিবের সেই কণ্ঠস্বর বাজিয়ে শোনানো হয়। তিনি বলেছিলেন পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের কাছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র এক চিরন্তন প্রেরণা। এর কিছুকাল পর মুজিব কলকাতায় এলেন। আবার উনি নেতাজি ভবনে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এবার বাধা হল সিকিওরিটি বা নিরাপত্তার প্রশ্ন। ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিব ময়দানে বিশাল জন সমাবেশে বক্তৃতা করেছিলেন। সন্ধ্যায় ইন্দিরা গান্ধী কলকাতার রাজভবনে মুজিবের সম্মানে ডিনার দিয়েছিলেন। সেই ডিনারে আমি ও শিশিরকুমার ছিলাম, আমি সেই একবারই ওঁকে দেখেছিলাম।

নেতাজি ভবনের প্রকাশনার কাজে শিশিরকুমারের বিশেষ সহায় ছিলেন বিনোদচন্দ্র চৌধুরী, সম্পর্কে তিনি আমার কাকা আর কাজ করতেন আনন্দবাজারে। প্রথম যখন বই প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়া হল তখন তীব্র

অর্থকষ্ট, কাগজ কেনা, ছাপাখানার বিল মেটানো কী করে হবে কেউ জানে না। প্রুফ দেখার সময়ে রাত জেগে কপি ধরে থাকতাম, শিশিরকুমার পড়ে যেতেন। বিনোদচন্দ্র সারাদিন প্রেসে বসে থাকতেন। ঠিক সময়ে বইটি প্রকাশ করা যাবে কি না ভেবে ওঁর রক্তচাপ বেড়েই চলত। হয়তো ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনের সকালে বইটি প্রকাশিত হবে আগের রাত্রে বিনোদচন্দ্র বলতেন এই শেষ বুঝেছ শিশির এবারের মতো উদ্ধার করি আর আমি এসবে নেই। এই নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম—যেই ২৩ পার হল—২৪ থেকে বিনোদচন্দ্র বলতে শুরু করতেন এ বছর তা হলে কোন বইটি করা যায়! স্বভাবে বিনোদচন্দ্র পরোপকারী ছিলেন । সকলের বিপদে আপদে অকৃতদার এই মানুষটি দাঁড়িয়ে যেতেন। শিশিরকুমারের ওপর ওঁর এক অবিচল আস্থা ছিল। উনি বিশ্বাস করতেন শিশির একটা মস্ত বড় কাজ করছে। প্রায়ই বলতেন শিশিরের খুব নাম হবে, একদিন ওর কাজের স্বীকৃতি হবে। বই প্রকাশের সেই প্রথম দিনগুলিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিনোদচন্দ্র নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোকে ঋণী করে রেখে গেছেন। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর যে বুক কাউন্টারটি আছে যেখানে দাঁড়িয়ে লোকে বই উলটেপালটে দেখেন, কেনাকাটা করেন শিশিরকুমার বসু তার নাম রেখেছিলেন বিনোদচন্দ্র চৌধুরী বুক শপ। বিনোদচন্দ্র নেতাজি ভবনে কাজ করে খুব গর্ব বোধ করতেন—প্রায়ই বলতেন 'একদিন নাম হবে'—অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানেরও নাম হবে সেই সঙ্গে ওঁরও।

নেতাজি ভবনের কাজে শিশিরকুমারের আর এক একান্ত সহযোগী ছিলেন অতুলেন্দু সেন। অতুল প্রায় ছায়াসঙ্গীর মতো শিশিরকুমারের সঙ্গে ছিলেন। আর্কাইভস ছবি, ফিলম্ এ সব অতুলের ওপর ভার থাকত। কোনও এক সময়ে আমরা নেতাজি প্রদর্শনী নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে ঘুরেছি। নেতাজির কথা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এ এক ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল শিশিরকুমারের। প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়া হল দিল্লি মুম্বাই (তখন বম্বে) আন্দামান, দার্জিলিং। ছবি সাজানো, সব ব্যবস্থা করা অতুলের হাতে। অনেক সময়েই শিশিরকুমারের সফরসঙ্গী আমি, সুন্দরম ও অতুল। অনেক সময় প্রদর্শনী নিয়ে কোথাও যাবার আগে অতুলকে পাঠানো হল জায়গাটি কেমন—হলঘর কত বড় কত ছবি ধরবে এ সব আগে গিয়ে তদারক করে আসতে হবে। তারপর আছে রাত জেগে সেই প্রদর্শনী সাজানো। প্রদর্শনী উদ্বোধন হলে লোক ভেঙে পড়ত। দেশবাসীর মনে নেতাজির জন্য যে আশা ও উদ্দীপনা আজও রয়েছে এই সব মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে তা বোঝা যেত। মুম্বাইর প্রদর্শনী উদ্বোধন হল হেমন্তকুমারের কণ্ঠে "তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো" গান দিয়ে। আন্দামানে সবচেয়ে রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলাম। কত বিপ্লবী এখানে

বন্দি থেকেছেন কতজন প্রাণ দিয়েছেন। নেতাজির হাতে আন্দামান তুলে দেওয়া হয় ডিসেম্বর ১৯৪৩-এ। উনি বলেছিলেন ফরাসি বিপ্লবে যেমন বাস্তিল কারাগার খুলে দেওয়া হয় আন্দামানের কুখ্যাত কারাগারও আজ মুক্ত। আন্দামান নিকোবর ভারতের প্রথম স্বাধীন ভূখণ্ড। নেতাজি নাম দিয়েছিলেন শহীদ ও স্বরাজ, স্বাধীন ভারত সে নামের স্বীকৃতি দেয়নি।

দার্জিলিঙের নেতাজি প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, পরনে সিল্কের শাড়ি, চুলে গোঁজা অর্কিড। পাহাড়ের মানুষ ভেঙে পড়ল নেতাজি প্রদর্শনী দেখতে। ম্যালের 'ক্যাপিটাল' সিনেমা হল-এ সেবার "নেতাজি-ইন-অ্যাকশন" ফিলম্টি দেখানো হয়েছিল।

সেখানেও হাউসফুল। এই "নেতাজি-ইন-অ্যাকশন" ফিলম্টি তৈরির ইতিহাস এইরকম। জাপান থেকে জার্মানি থেকে, ভারতবর্ষ থেকেও তিলে তিলে জোগাড় করা ফিলম্-এর টুকরো আর্কাইভস-এ জমছিল। আমাদের এডিট করে, ডিরেক্ট করে ছবি তৈরির লোক নেই, পরিকাঠামো নেই, নেই অর্থসংস্থান। তখন শিশিরকুমার ঠিক করলেন মোটামুটি ভারতবর্ষ, জার্মানি, জাপান এই ভাবে জুড়ে ফিলম্টি গ্রথিত করে রাখবেন। টালিগঞ্জের কোনও স্টুডিওতে গিয়ে শিশিরকুমার ও অতুল কাজটি করলেন। এইটি যেখানেই দেখানো হত, ভিড় ভেঙে পড়ত। এর বহুদিন বাদে সুগত আমেরিকায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকার সময়ে ফিলম তৈরিতে উৎসাহিত হয়ে পর পর দুটি ফিলম্ নিজে করেছিল একটি "রেবেলস্ এগেন্সট দ্য রাজ" গান্ধীজি ও নেতাজির কথা অপরটি ইলেকশন্-এর ওপর 'মন্দির, মসজিদ, মণ্ডল অ্যান্ড মার্কস'। এরপর সুগত আমাদের "নেতাজি-ইন-অ্যাকশন" ফিলম্টি সুষ্ঠুভাবে এডিট করে ও পরিচালনা করে "নেতাজি অ্যান্ড ইন্ডিয়াজ্ ফ্রিডাম" ফিলম্টি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর পক্ষে তৈরি করল। তখন থেকে এই ফিলম্টিই আমাদের প্রধান ফিলম্ বলে পরিগণিত হল।

দার্জিলিং প্রদর্শনীর শেষ দিকের একটা কাহিনী বলি। প্রদর্শনী শেষ হতে আরও ক'দিন বাকি। সুন্দরমকে রেখে আমি, শিশিরকুমার ও অতুল সেন কলকাতাগামী প্লেনে উঠেছি। সেকালের জামেয়ার এয়ারলাইনস, ছোট প্লেন। কলকাতার কাছাকাছি এসে প্লেন প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ে পড়ল। প্লেন এপাশ ওপাশ দুলছে, কখনও কাচের জানালার বাইরে বিদ্যুৎ আছড়ে পড়ছে, কখনও ঝমঝম বৃষ্টি। সকলেরই প্রাণ সংশয়। প্রথমে কলকাতার বদলে ঢাকাতে ল্যান্ড করার চেষ্টা হল। তারপর দেখি একটি ছোট এয়ারস্ট্রিপে আমরা নামছি, নীচে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার ব্রিগেড। ল্যান্ড করার পর কলাইকুণ্ডা এয়ারস্ট্রিপে এরোপ্লেনের ডানার তলায় বসে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে

আমরা কে কী ভেবেছিলাম তার আলোচনা হল। আমি কলকাতায় রেখে এসেছি শিশুপুত্র ও কন্যা। তাদের দাদুয়া-দিদার কাছে। আমি ভাবছিলাম এত বড় শোকের ধাক্কা সহ্য করে বাবা-মা ওদের বড় করে তুলতে পারবেন তো?

অতুল বললেন, আমি কী ভাবছিলাম জানেন? আমরা নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে কষ্ট করে কত কাজ করি তার জন্য কোনও প্রচার তো পাই না। তা কাল খবর কাগজ খুলে লোকে পড়বে নেতাজি প্রদর্শনী উপস্থাপন করে ফিরবার পথে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর পুরো টিম বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ দিয়েছে তখন যা পাবলিসিটি হবে না—উফ্।

অতুলের কথাবার্তা ওইরকমই ছিল—আমুদে ও রসিক। আমাদের সেই ঝড়েপড়া এরোপ্লেনের পাইলট ছিলেন এক মহিলা—দুর্বা ব্যানার্জী।

এক এক শহরে নেতাজি প্রদর্শনী সাজিয়ে দেবার পর—উদ্বোধন হয়ে গেলে অনেক সময় স্থানীয় অনুষ্ঠান কর্তারা আর আমাদের তত পাত্তা দিতেন না—অতুলের অন্তত সেইরকম মনে হত। তখন অতুল বলতেন—যাঃ বিয়ে হয়ে গেছে তো—আর বরযাত্রীদের কে দেখবে বলুন।

নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে 'নেতাজি অ্যাওয়ার্ড' বা নেতাজি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। জেনারেল ফুজিয়ারা আশির দশকের মাঝামাঝি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর এল। সে সময়ে একদিন রিসার্চ ব্যুরোর সদস্যদের একটি মিটিং-এ আমি বলেছিলাম, কোনওমতে জেনারেল ফুজিয়ারাকে আমাদের পক্ষ থেকে কোনও বিশেষ সম্মান জানানো যায় না কি? ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য একজন বিদেশি এত করেছেন—ওকে ঐতিহাসিকেরা লরেন্স অব ইন্ডিয়া বলে থাকেন।

লক্ষ্মী সায়গল বললেন, ভারত সরকারের উচিত ওঁকে অনারারি সিটিজেনশিপ বা সাম্মানিক ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া।

কিন্তু ভারত সরকারের মুখ চেয়ে বসে থাকলে কোনওদিন কিছু হবে না। কোনও কোনও সদস্যরা বললেন "গান্ধী পুরস্কার" "নেহরু পুরস্কার" এ সবের লক্ষ লক্ষ টাকার অর্থমূল্য থাকে। আমাদের তো সেরকম করার ক্ষমতা নেই।

আমি বললাম, অর্থমূল্যের প্রয়োজন নেই, আমরা কি একটা পদক বা রুপোর মানপত্র কিছু করতে পারি না যা কি না একটা প্রতীকী সম্মান হবে। সেইমতো ১৯৮৬ সালে জেনারেল ফুজিয়ারা নেতাজি অ্যাওয়ার্ড পেলেন, সুন্দর রৌপ্য মানপত্র। সেইটুকু করতে গিয়েও আমাদের যথেষ্ট কষ্ট হল। কিন্তু সব সদস্যের মনে তৃপ্তি হল। টোকিওতে হাসপাতালে তখন ফুজিয়ারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। ওঁর পক্ষে কলকাতা আসা সম্ভব নয়। জাপানের কনসাল-জেনারেল ওঁর হয়ে ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৬ পুরস্কার গ্রহণ করলেন এবং

ফেব্রুয়ারির প্রথমে স্বয়ং নিজে গিয়ে টোকিওতে হাসপাতালে ফুজিয়ারার হাতে তুলে দেন। শুনেছি তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন।

এর পর পর নেতাজি অ্যাওয়ার্ড আরও কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবছরই এবার নেতাজি অ্যাওয়ার্ডে কে ভূষিত হবেন তাই নিয়ে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি হত। পাকিস্তান দুবার এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। ১৯৮৭-তে জেনারেল জমান কিয়ানি। তিনি মরণোত্তর পেয়েছিলেন। মিসেস কিয়ানি ও তাঁর কন্যা জাহিদা লাহোর থেকে এসে কিয়ানির হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন। আর একবার পেলেন কর্নেল আর্শাদ। আর্শাদ ও তাঁর স্ত্রী এলেন কলকাতায়। জার্মানি থেকে পেলেন আলেকজান্ডার ওয়ার্থ আর এক বিদেশি ভারতবন্ধু। লালকেল্লাখ্যাত তিন আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীকে একই সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তার পরের বছর রানি অব ঝাঁসি রেজিমেন্টের লক্ষ্মী সায়গল ও জানকী অথিনাহাপ্পন পেলেন একসঙ্গে। নেতাজির সহযোগী ছাড়াও নেতাজির ওপর গবেষণা করেছেন, কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিকেও দেওয়া যাবে নিয়মাবলিতে তাই ছিল। ১৯৯০-তে পেয়েছিলেন অধ্যাপক লিওনার্ড গর্ডন। তাঁর লেখা বই "ব্রাদারস এগেন্সট দ্য রাজ" শরৎ-সুভাষ বসুর যুক্ত জীবনী লেখার জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৯৬-তে কর্নেল আর্শাদের পর আমরা এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া বন্ধ করি। নেতাজির সহযোগী সহযোদ্ধা কালের নিয়মে আর পাওয়া যেত না। উৎকৃষ্ট মানের কাজ নেতাজির ওপর হচ্ছে তেমনও পাওয়া সহজ নয়।

নেতাজির শতবর্ষ আমরা যথাসাধ্য ভালভাবে পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সদস্যরা ছাড়াও আরও অনেককে নিয়ে বর্ধিত আন্তর্জাতিক নেতাজি সেন্টিনারি কমিটি গঠিত হল। এমন বর্ধিত অরগ্যানাইজিং কমিটি প্রায় প্রতিবছরই করা হত। আরও একটা ব্যাপার আমাদের খুব ভাল লাগত যে অনেক অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে—ইতিহাস, পলিটিক্যাল সায়েন্স বা অর্থনীতির ছাত্রছাত্রী হয়তো তারা পড়াশুনো করছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রেসিডেন্সি কলেজে। জন্মদিনের সময় আমাদের সঙ্গে একান্তভাবে কাজ করত। তাদেরও খুব ভাল লাগত কত দেশবিদেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, নেতাজির সহযোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। সাধারণত একটি দল হয় দুই বা তিন বছর যুক্ত রইল। তারপর মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, কেউ বা বিদেশে পড়তে যায়, কেউ বা চাকরিতে যোগ দেয় তখন নতুন আর একদল তরুণতরুণী তাদের জায়গা নেয়।

একটি নিরন্তর নেতাজি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো দেশে

ও বিদেশে আপন জায়গা করে নিয়েছিল। বই বার হচ্ছে, ফিলম্ তৈরি হচ্ছে, কনফারেন্স হচ্ছে, নেতাজির সহযোগীদের আসা-যাওয়া চলছে। প্রায় প্রতি বছর আসতেন আবিদ হাসান। ঠিক জন্মদিনের আগে ২২ জানুয়ারি দরজায় বেল বাজবে—'কৃষ্ণা, আই হ্যাভ কাম' সুটকেস হাতে দাঁড়ানো আবিদ হাসান। আবিদের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা নেতাজির সঙ্গে সাবমেরিনে নব্বুইদিন ধরে জার্মানি থেকে জাপানে আসা। ওঁকে জোর করে ধরে বসিয়ে এই সাবমেরিন যাত্রার কথা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলাম। আর যাঁদের কথা মনে পড়ে তার মধ্যে আছেন মেহবুব আহমেদ। সুগত একবার ওঁকে ওর নিজের ফিলমের জন্য ইন্টারভিউ করেছিল। সেই সাক্ষাৎকারে মেহবুব বলেছিলেন—আমি খুব ভাগ্যবান আমি নেহরুর সঙ্গে কাজ করেছি, গান্ধীজির সঙ্গেও কাজ করেছি, নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলাম। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো আমি তবে বলব মাত্র একজনই আছেন যাঁর জন্য আমি একবার কেন শতাধিকবার মৃত্যু বরণ করতে পারি—তাঁর নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

আর একজন একনিষ্ঠ অফিসার দেখেছিলাম, সিরিল জন স্ট্রেসি। ইনি সিঙ্গাপুরে আই. এন. এ. মেমোরিয়ালটি গড়ে দেবার ভার পেয়েছিলেন। নেতাজিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে যুদ্ধের সেই শেষ সময়ে আসন্ন পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে সেই শহিদ স্তম্ভ গড়ে দিয়েছিলেন। স্তম্ভের মাথায় লেখা ছিল আই.এন.এ-র মটো—ইত্তেফাক, ইতমাদ, কুরবানি—একতা বিশ্বাস ও বলিদান। সিঙ্গাপুর পুনর্দখল করার পর মাউন্টব্যাটেন সিঙ্গাপুরে পা দিয়েই প্রথমে এই শহিদ স্তম্ভটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেন।

শিশিরকুমারের মনে একটা ক্ষোভ ছিল যে তার পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসুর যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। যদিও সকলেই একবাক্যে বলেন মেজদাদা শরৎচন্দ্র না থাকলে আমরা অনুজ সুভাষকে কোনওদিনই পেতাম না। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো থেকে শরৎচন্দ্র বসুর বক্তৃতা ইত্যাদির সংকলন প্রকাশিত হল "আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন" তারপর বার হল "দি ভয়েস অফ শরৎচন্দ্র"। শরৎচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ খুব আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করেছিল নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো। শতবর্ষের গোড়ায় লিওনার্ড গর্ডন শরৎচন্দ্র বসু অরেশন দিয়েছিলেন। আর জন্মশতবর্ষ শেষ হবার দিন—টোনি বেন, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, হাউস অফ কমনস সমাপ্তি ভাষণ দিলেন। টোনি বেন আসবেন শুনে আমাদের বামপন্থী বন্ধুরা খুব চমৎকৃত হয়েছিলেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজভবনে চা-পার্টিতে দেখা হতে শিশিরকে হাঁক দিয়ে বলেছিলেন—আরে টোনি বেন আসবেন আমাদের কিছু বলছেন না। আমরা ওকে ডিনার-এ ডেকেছিলাম।

টোনি বেন-এর সম্মানে ডাকা সেই ডিনারে জ্যোতিবাবু উপস্থিত ছিলেন। তবে নেতাজি ভবনের অন্য কোনও কাজে বা অনুষ্ঠানে জ্যোতিবাবু বা বামফ্রন্ট সরকারের কাউকে কোনওদিনই পাওয়া যায়নি। প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হবার পর নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর আমন্ত্রণে উনি ২৩ জানুয়ারি জন্মদিনের সমাবেশে এসেছিলেন বক্তৃতাও করেছিলেন। ওঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উনি ছাড়া ছাড়া ভাবে বলেছিলেন—আমাকে ওঁরা ডেকেছেন, কেন ডেকেছেন জানি না—তা বোধ হয় আমি চিফ মিনিস্টার হয়েছি বলেই বলেছেন। এখানে জনান্তিকে বলে রাখা ভাল—স্বাধীনতার পর থেকেই ট্র্যাডিশন চলে আসছে পশ্চিমবাংলার গভর্নর জন্মদিনে নেতাজি ভবনে আসবেন। হরেনবাবু, পদ্মজা নাইডু থেকে শুরু করে সকলেই আসতেন, আজও আসেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে সিদ্ধার্থ রায় প্রতি জন্মোৎসবে উপস্থিত থাকতেন। বিধান রায় জন্মোৎসবে না হলেও এমনি নেতাজি ভবনে এসেছেন। একবার মনে পড়ে জরাজীর্ণ নেতাজি ভবন দেখে উনি বললেন—ওহে, এসো এ বাড়িটা ভেঙে ফেলা যাক। উনি পুরাতন ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে ফেলে ঝকঝকে নতুন কিছু তৈরি করতে এবং সম্ভব হলে হাসপাতাল করে দিতে চাইতেন। যেমন করেছিলেন চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল। ঐতিহাসিক গৃহ সংরক্ষণের মূল্য যদি ওঁর জানা থাকত তবে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থামওয়ালা সেনেট হাউস আজও থাকত।

সে যাই হোক, সেদিনের বক্তৃতায় জ্যোতিবাবু স্বীকার করেছিলেন তাঁরা যুদ্ধের সময়ে নেতাজির বিরোধিতা করে ঠিক করেননি, নেতাজির দেশপ্রেমের মূল্যায়নে তাদের ভুল হয়েছিল। পরদিন বাংলা কাগজে বড় হেডলাইন হল "ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে!"

জ্যোতিবাবুর নেতাজি ভবনে সেই প্রথম এবং শেষ আগমন।

এখন মাঝে মাঝে পিছন ফিরে ভাবলে অবাক লাগে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা অথবা কখনও প্রত্যক্ষ অসহযোগিতা সত্ত্বেও কী ভাবে শিশিরকুমার নেতাজি ভবনে নেতাজির জীবন ও কর্ম রক্ষার কাজ চালিয়ে গেলেন। কেন্দ্রীয় সরকারও ছিলেন উদাসীন। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে খুচরো সহযোগিতা পাওয়া যেত। হয়তো একটা বই প্রকাশ করতে হবে বা একটি সেমিনারের আয়োজন করতে হবে—তার জন্য সামান্য কিছু অনুদান দেওয়া হল। একবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জীর্ণ বাড়িটি সারাবার জন্য একটা সামান্য গ্রান্টের ব্যবস্থা করেছিলেন। সামান্য হলেও তা খুব কাজে লেগেছিল।

কংগ্রেস যখন ভাঙল একদিক হল পুরাতন বা আদি কংগ্রেস অন্য দিকে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে 'নব কংগ্রেস'। এই নব কংগ্রেসের সময়ে শিশিরকুমার ইন্দিরা গান্ধীর কাজকর্মের প্রতি এক ধরনের উৎসাহ বোধ করতেন। আমার

মনে হত এই যে কংগ্রেসের ওলড গার্ডদের তোয়াক্কা না করে ইন্দিরা কংগ্রেস ভেঙে প্রায় পুরো কংগ্রেস নিজের কবজায় নিয়ে এলেন এতে উনি এক ধরনের সন্তোষ বোধ করতেন। ওঁর মনে হত কংগ্রেসের এককালের 'ওলড গার্ড'রা তাঁর রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্রকে খুবই উৎপাত করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসকে দুর্বল করতে চাননি, ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল করতে চাননি নিজেই পদত্যাগ করেছিলেন এবং পরে দেশত্যাগ করে দেশের বাইরে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। এই দুটি ঘটনার কোনও তুলনা হয় না। শুধু সুভাষচন্দ্র যা পারেননি বা যা করতে চাননি ইন্দিরা গান্ধী করেছিলেন, প্রবীণ নেতৃত্বকে জোর ধাক্কা দিতে পেরেছিলেন। এই ধাক্কা দিতে পারার ঘটনাই ওঁর মনে একটা পরিতৃপ্তি এনে দিত।

বেশ দূরত্ব বজায় রেখেও শিশিরকুমারের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর একধরনের একটা সম্পর্ক ছিল। কারও সঙ্গে আলাপে ঢলে পড়া শিশিরকুমারের স্বভাব বিরোধী ছিল। আবার কারও সঙ্গে কোনও বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক থাকলে সেটা বজায় রাখতেন, অস্থিরমতি হয়ে এদিক ওদিক করতেন না। প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে ইন্দিরার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল ইমার্জেন্সির সময়ে যখন ইন্দিরা প্রবল সমালোচনার মুখে তখনও একই সম্পর্ক রইল।

নির্বাচনে পরাজয়ের পর যখন ইন্দিরা গান্ধীকে সকলে রাতারাতি ত্যাগ করলেন তখনও শিশিরকুমারের সঙ্গে একই সম্পর্ক রইল। এই সময়ে যখনই দিল্লিতে দু-একবার দেখা হয়েছে ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করেছেন—"তুমি কি শুধু এই কাজই করবে?

"আবার একটা বই বার করেছ? আরও একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার? হোয়াট অ্যাবাউট ডুয়িং সামথিং এলস?"

"এই ডুয়িং সামথিং এলস"-এর ফলেই ১৯৮২ তে বিধানসভার নির্বাচনে ইন্দিরা ওকে কলকাতার চৌরঙ্গি কেন্দ্রে দাঁড়াতে বললেন। উনি বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন। কারণ উনি তো কিছু চাননি। স্বাধীনতার আগে যে বিপ্লবের রাজনীতির সঙ্গে উনি জড়িত ছিলেন আজকের রাজনীতির সঙ্গে তার ফারাক অনেক। ইংরেজি খবর কাগজে শিরোনাম হল "Bhadralok goes to politics" কলকাতায় মানুষ, বাংলার মানুষ ইন্দিরা গান্ধী এই অপ্রত্যাশিত পছন্দে আশ্চর্য হয়েছিল, খুশিও হয়েছিল। ১৯৮২-তে উনি চৌরঙ্গি থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তবে সংসারে যেমন ওঁর মন ছিল না, রাজনীতিতেও সেভাবে মন ছিল না। ওঁর মন প্রাণ জুড়ে ছিলেন সুভাষচন্দ্র আর তা ছাড়া নেতাজি ভবন। তবে উনি কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন কোনও কর্তব্যে অবহেলা ছিল না। উনি বিধায়ক থাকার

সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল। উনি পশ্চিমবাংলার প্রতি জেলা ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছিলেন। পুরুলিয়া শুধু বাদ ছিল, সময় পাওয়া যায়নি। সাধারণত রাজনীতিকরা নিজেদের প্রচারেরও ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শিশিরকুমার নীরব কর্মী ছিলেন। বিশেষ কেউ জানলই না উনি কীরকম পরিশ্রম করেছিলেন। সেবার পঞ্চায়েতে কংগ্রেস অপেক্ষাকৃত ভাল ফল করেছিল।

ইন্দিরা গান্ধী ওঁর কাছে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর হতাশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। উনি বলেছিলেন, হতাশ হবার কী হল চেষ্টা করলে হাল ফেরানো যায়। ইন্দিরা বলেছিলেন, এখানে এত দল আর উপদল এত কলহ কী বলব। এক একবার এসে দেখি এক একরকম দৃশ্য। আমি যে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আমিই বুঝতে পারি না। 'হু ইজ ফাইটিং হুম, অ্যাট হোয়াট পয়েন্ট' কে কখন কার শত্রু বা মিত্র বুঝবার উপায় নেই।

শিশিরকুমার স্থির করলেন দলে নতুন প্রতিভা আনতে হবে। কর্পোরেশন ইলেকশন সামনে। উনি বিভিন্ন কাউন্সিলর পদের জন্য নির্বাচন করলেন—সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, শিল্পী স্বাধীনতা সংগ্রামী। এক এক ওয়ার্ডের জন্য এক একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। ওঁর অনুরোধে রাজিও হলেন অনেকে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল এরকম হবার নয়। বিভিন্ন দল উপদলের নেতারা চান তাদের অনুগত ক্যাডারদের মধ্যে থেকে যে যত পারেন প্রার্থী করবেন। বিশিষ্ট বা প্রতিভাবান মানুষ দিয়ে কী-ই বা হবে। শিশিরকুমার বুঝলেন তাঁর এসব মহৎ আদর্শ বাস্তবসম্মত নয়।

শিশিরকুমারকে ইন্দিরা কেন রাজনীতিতে নামালেন তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। প্রথমে শোনা গেল উনি বিরোধী দলনেতা হবেন, কংগ্রেস তখন বিরোধী দলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের দল-উপদল রে, রে করে সেটা থামালেন। তারপর শোনা গেল ইন্দিরা চাইছেন উনি প্রদেশ কংগ্রেসের ভার নিন। নতুন করে সব করা হবে। গোপাল দাস নাগ ও আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওঁর বেশ সুসম্পর্ক ছিল। ওঁরা এসে দেখা করলেন যেন কাল সকালের প্লেনে দিল্লি যেতে হবে—এমনি সব ব্যবস্থা হল। সেই রাতেই আবার রে, রে করে কেউ ব্যাপারটা ঠেকাতে নেমে পড়লেন। আমরা সত্যিই ইনোসেন্টস ইন পলিটিকস ছিলাম। শিশিরকুমার কোনও পদে যেতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুকও ছিলেন না। তাই কেন কী ঘটছে বুঝতে অসুবিধা হল। পরে শুনেছিলাম সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে যে দুটি গোষ্ঠীর কাজিয়া ছিল তারা শিশিরকুমারের আনুগত্য কোন দিকে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। কেউ যে উভয় গোষ্ঠীর বাইরে স্বাধীনচেতা থাকতে পারেন সেটা তাদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। তাই এক দল ভাবলেন উনি নিশ্চয় অপরদলের আর এক

পক্ষ ধরে নিলেন তিনি অন্য পক্ষের। তারই জেরে অনেক কিছু ঘটছিল।

বিধায়ক থাকুন আর নাই থাকুন নেতাজি ভবনের কাজে কোনও বাধা হবে না। তবে সব দিক সামলাতে ব্যস্ততা একটু বেড়ে গেল ঠিকই।

এই সময়ে ইংলন্ডের গ্রানাডা টেলিভিশন নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর কাছে প্রস্তাব নিয়ে এল তারা নেতাজির ওপর একটি ডকুমেন্টারি ছবি করতে চায়। নেতাজির ওপর কেউ কোনও কাজ করতে চায় তা সে ছবি আঁকা, বই লেখা, ফিলম্ করা যাই হোক না কেন—শুনলেই শিশিরকুমার বিগলিত হয়ে যেতেন এবং সাহায্য করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতেন। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। তবুও সে সময়ে বিধানসভার অধিবেশন চলছিল তাই সেই আলাপ আলোচনার সময়ে শিশিরকুমার যথেষ্ট সময় দিতে পারেননি। তা হলেও নিয়ম অনুসারে তাদের লিখিত সিনপসিস দিতে বলা হল, এরাও দিলেন। তাতে নেতাজিকে যথেষ্ট ভালভাবে দেখানো হয়েছে। শিশিরকুমারের মাথায় ছিল কেউ যদি নেতাজিকে সমালোচনা করতে চায় অবশ্যই করতে পারে।

কিন্তু সমালোচনার উত্তর দেবার অধিকারও অপর পক্ষের থাকবে। ওদিকে ফিলিপ মেসন্, হিউ টয় এঁরা বলবেন। কিন্তু অপরদিকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে আবিদ হাসান, প্রেম সায়গল, লক্ষ্মী সায়গল, শিশির বসুর। যে ভাবে সিনপসিস বা সংক্ষিপ্ত কাঠামো লেখা হয়েছে তাতে এদিকেরই পাল্লা ভারী।

কিন্তু কার্যকালে খুব চতুর এডিটিং করে এদিককার সকলের বেশির ভাগ বক্তব্য ছেঁটে ফেলে দিয়ে এমনভাবে স্ক্রিপট্ দাঁড়াল যাতে যে সিনপসিস দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রইল না। অপরদিকে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার জুড়ে দেওয়া হল। অথচ আমরা জানতাম উনি এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে অস্বীকার করেছিলেন। পরে নিশ্চয় মত বদলান। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নীরদ চৌধুরীর মতামত সকলেরই জানা। ওঁর মতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বুদ্ধিবিবেচনা বিশেষ ছিল না, সব পদক্ষেপই ছিল ভুল। উনি একজন ব্যর্থ নেতা। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা উনি সবসময়ে বলতেন যে সুভাষচন্দ্রকে উনি শ্রদ্ধা করেন কারণ ভুল হোক বা না হোক—এই একমাত্র নেতা যিনি তাঁর বিশ্বাসের জন্য জীবন দিয়েছেন।

এই শেষের কমেন্টটা মনে হয় চতুর এডিটিং-এ ছাঁটাই হয়ে যায় ফলে ছবিটি একান্ত ভাবে একপেশে হয়ে যায়।

গ্রানাডার এই ডকুমেন্টারির জন্য ওঁকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। বিধানসভায় ওঁর বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব আনা হল। অনেক তথাকথিত বন্ধুজন ও আপনজন খবর কাগজে বিবৃতি দিয়ে গালমন্দ করলেন, কুৎসাপূর্ণ প্যামফ্লেট ছেপে ঘরে ঘরে বিলি করলেন। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে আত্মীয়তার

সুবাদে আমিও বাদ গেলাম না। আমার অপরাধ কী? কোনও এক বাংলা খবর কাগজ লিখল, ইনি শ্রীমতী বসুর খুল্লতাত। সেই সময়ে আমরা অনেকেই শিশিরকুমারের মনের জোর ও ধৈর্যের পরিচয় পেলাম। উনি আপনমনে অবিচলভাবে নেতাজি ভবনে কাজকর্ম করে চললেন। 'আপনার বিরুদ্ধে আপনার বিশেষ প্রিয়জনেরা এত অপবাদ দিচ্ছেন আপনি জবাবে কিছু বলবেন না?' সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে উনি বলেছিলেন, 'না, আমি কিছু বলব না। ইট ইজ বিনিদ্ মাই ডিগনিটি—It is beneath my dignity.' ওই একটি বাক্যের মূল্য অনেক বেশি হয়েছিল। এই গ্রানাডা বিতর্কের সময় প্রবল ও কুৎসিত সমালোচনার মুখে দাঁড়িয়ে ওঁর এই সংযম বহু মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। ওঁর কাজের প্রতি উনি বিশ্বস্ত থাকতেন—গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও তাঁর পিতৃদেব শরৎচন্দ্র বসুর কর্ম ও জীবন রক্ষা করে উনি দেশের প্রতি কর্তব্য করছেন, নিজের স্বার্থের জন্য কিছু করছেন না। ওর মনের জোরের উৎস ছিল এইখানে। একবার বলেছিলেন "My strength is as the strength of ten because my heart is pure." যখন ওঁর নিতান্ত আপনজনেরা কেউ কেউ ওঁর কাজের বিরোধিতা করলেন, ওঁকে ত্যাগ করলেন উনি গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন, মুখে কিছু বলেননি।

মানুষ কি তার আসন্ন মৃত্যুর কথা জানতে পারে? মৃত্যুর অল্পদিন আগে উনি এমন দু-একটি কথা বলেছিলেন যা পিছন ফিরে ভাবলে খুবই আশ্চর্য লাগে। একদিন বললেন, আমার পরিবারের কিছু নিকটজন আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন।

আমি অনেক ভেবেছি কেন এমন হল? আমার কী অপরাধ? আমি তো জীবনে কারও সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করিনি বরং শুধু ডাক্তার হিসেবে নয়, শুধু চিকিৎসার কারণে নয়, যে কোনও পারিবারিক সংকটে সকলে আমার কাছে এসেছে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সাহায্য করতে। ভেবে দেখলাম এই যে আমি বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর স্মৃতি রক্ষার জন্য যে কাজটি করছি তা তাদের পছন্দ নয়। আর এটাই আমার একমাত্র অপরাধ।

আমি তখন বললাম, কে তোমাকে এই কাজ মাথায় তুলে নিতে বলেছিল? যদি এ সব কাজে না যেতে, কারও বিরাগের কারণ হতে হত না, নিজের প্রফেশন, মন দিয়ে করতে পারতে, নিজের পুত্রকন্যা পরিবার নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন হতে পারত।

মৃদু হেসে এর উত্তরে বললেন, তা হবার নয়, আবারও যদি জন্মগ্রহণ করি, আবারও এই কাজই করব।

এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সত্যিই ওঁর মনের মধ্যে যে দাঁড়িপাল্লা ছিল তার একদিকে রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র আর অন্যদিকে আর সবকিছু। এর ফলে ওঁর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নিজস্ব প্রতিভা ছিল তা বিকাশের পথে বাধা হত, নয়তো বিকাশে বিলম্ব হত। শিশু চিকিৎসক হিসেবে ওঁর যে দেশজোড়া নাম তা ধীরে ধীরে হয়েছিল, বলতে গেলে ওঁর দিক থেকে কোনও চেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও হয়েছিল। উনি সুলেখক ছিলেন ওঁর লেখা 'মহানিষ্ক্রমণ', 'বসুবাড়ি' বা 'বাবার কথা' সাহিত্যিক ও পাঠকমহলে সমাদর পেয়েছিল। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতে উনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন। 'Remembering My Father' ও তার বাংলা 'বাবার কথা' স্মৃতিচিত্র ও সামাজিক দলিল হিসেবে তো বটেই সাহিত্য হিসেবেও অত্যন্ত উঁচুদরের বই। শেষ জীবনে উনি কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং আমাদের অবাক করে দিয়ে খুবই সুন্দর কবিতা লিখতে থাকেন। 'উত্তরাধিকার' 'কাজ চলছে' প্রভৃতি সব কবিতাতেই কেন্দ্রবিন্দুতে সেই সুভাষচন্দ্র ও তার প্রেরণা।

রাজনীতিতে এলেও উনি দেশের জন্য অনেক কাজ করতে পারতেন। ভাবলে দুঃখ হয় যারা শিশিরকুমারের মতোই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদের জীবন-যৌবন বিসর্জন দিয়েছিলেন—দেশ গড়ার কাজে তাঁরা কোনও সুযোগ পেলেন না। এঁদেরই কথা মনে করে করাচিতে শায়েস্তা সুরাবর্দি আমাকে একটি উর্দু শায়েরি শুনিয়েছিলেন। আমি ও শিশিরকুমার একটি মানবাধিকার সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তান গিয়েছিলাম। সেখানে শাহেদ সুরাবর্দির বোন শায়েস্তার সঙ্গে দেখা। প্রবীণা এই মহিলা আমাদের দেখে খুব খুশি, কলকাতার সুরাবর্দি অ্যাভেনিউতে তাদের পৈতৃক বাড়িটির কথা জিজ্ঞাসা করতেন। আমি বলছিলাম যে স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের এত কষ্ট কেন? শায়েস্তা বললেন, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব দিয়েছিল ঠিক তাদের হাতে দেশের ক্ষমতা গেল না। "মঞ্জিল উসকো মিলে যো শরিকে সফর ন থে"—জয় তাদের হল যারা এই দৌড়ে সামিলই ছিল না।

অল্পদিনের জন্য রাজনীতিতে এসে উনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজনীতি থেকে আকস্মিক ভাবে সরে যান। এখানেও ওঁর এই একনিষ্ঠ সুভাষ সাধনার একটা ভূমিকা আছে। উনি সুভাষচন্দ্রের কাজ নিয়ে থাকতে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। রাজীবের জমানায় তাকে ঘিরে যে নতুন প্রজন্মের তরুণদের দল গড়ে উঠেছিল ওঁর মনে হত এরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে, স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে অজ্ঞ আর সুভাষচন্দ্র বা অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তত শ্রদ্ধাশীল নয়। ওঁর এই ধারণা সঠিক ছিল কি না বলা কঠিন। অথবা হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এরকম আশা করাই ভুল।

নেতাজির কাজে সামান্য সাহায্য বা উৎসাহের জন্য উনি ক্ষমতার দোরে দোরে ঘুরেছেন, বেশির ভাগ সময়ে শূন্য হাতে ফিরেছেন। ওঁর সঙ্গে আমাকেও মাঝে মাঝে এই ধরনের দৌত্যে থাকতে হয়েছে। রাজধানীর চেয়ারকারে চড়ে দিল্লি যাওয়া, ট্যাক্সি সামর্থ্যের বাইরে স্কুটারে চড়ে এই মন্ত্রী থেকে সেই মন্ত্রীর দুয়ারে ঘোরা, দিল্লির গরমে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে থাকা কী যে না করেছেন।

অনেককাল পরে আমি যখন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হলাম তখন নেতাজির কাজে সামান্য কিছু করতে পারলেও শিশিরকুমার এত খুশি হতেন বলার নয়।

অনেকদিন ধরে ওঁর ইচ্ছা ছিল ভবানীপুর মেট্রো রেল স্টেশনটির নাম নেতাজি ভবন স্টেশন করা হোক। অনেক চিঠিপত্র আদান প্রদান চলল কিন্তু কিছুই আর হয় না। রামবিলাস পাসোয়ান রেলমন্ত্রী, একটি রেল সংক্রান্ত বৈঠকে অন্য আরও সাংসদদের সঙ্গে আমিও উপস্থিত আছি। আমি রামবিলাস পাসোয়ানকে বললাম আমার দুটো বক্তব্য আছে—এক দার্জিলিং হিমালয়ান রেলকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা আর দ্বিতীয়টি আরও ক্ষুদ্র অনুরোধ 'নেতাজি ভবন স্টেশন' নাম করা। মন্ত্রীমশাই বললেন হো জায়গা। কয়েকদিনের মধ্যে করেও দিলেন।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যরাতের অধিবেশন বসবে শোনা গেল। সেখানে জওহরলাল ও গান্ধীজির বক্তৃতার টেপ বাজিয়ে শোনানো হবে। আমি স্পিকারকে অনুরোধ করলাম নেতাজির কণ্ঠস্বরও শোনানো উচিত। এত দেরি হয়ে গেছে এখন আর সম্ভব নয় নানান অজুহাত আমাকে শোনানো হল। আমি বললাম আমি অন্তত পার্লামেন্টে কথাটা উল্লেখ করি তারপর যদি না হয় কী আর করব। পরদিন জিরো আওয়ারে আমি আমার বক্তব্য বলা মাত্র দলমত নির্বিশেষে সকলে ডেস্ক চাপড়ে আমাকে সমর্থন করলেন, বেশ হই হই পড়ে গেল। স্পিকার সাংমা বললেন—ঠিক আছে শান্ত হন, আমি বুঝে গেছি সবাই মিসেস বসুর প্রস্তাব সমর্থন করছেন। তবুও কিছু হয় না। শেষে আমি এক দিন চিলতে কাগজে নোট লিখলাম প্রধানমন্ত্রী গুজরালের উদ্দেশে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে তার নির্দিষ্ট আসনে বসেছিলেন। আমি লিখলাম, আপনি তো দেখেছেন সব সাংসদ আমার প্রস্তাব সমর্থন করেছেন—এখন আপনার কাছ থেকে আমি নির্দেশের প্রত্যাশী। ইংরেজিতে লিখেছিলাম—আই নীড অ্যা নড্ ফ্রম ইউ। চাপরাশি চিরকুট প্রধানমন্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিল—উনি মুখ তুলে আমার দিকে দেখলেন আর একটু হেসে নড্ করলেন। তারপরই স্পিকার আমাকে ডেকে পাঠিয়ে

দেখালেন প্রধানমন্ত্রী নোট দিয়েছেন—আই ফুললি এগ্রি উইথ মিসেস বোস।

সেদিন মধ্যরাতে যখন গমগম করে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বেজে উঠল তখন শিশিরকুমার আমার সঙ্গে সেন্ট্রাল হল-এ বসেছিলেন। মুর্হুমুহু করতালির মধ্যে সেই হিন্দি ভাষণ সবাইকে মুগ্ধ করল। আমি বলেছিলাম আপনারা কীসের ভয় করছিলেন—কে যেন মুচকে হেসে বলল—এই স্বতঃস্ফুর্ত উচ্ছ্বাসই ওরা ভয় করছিলেন।

আরও একটি আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র নেতাজির নামাঙ্কিত কাজে শিশিরকুমার অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। আমি পার্লামেন্টে প্রশ্ন করেছিলাম, অনেক ধুমধাম করে টাকাপয়সা খরচ করে বিমানবন্দর-এর নাম দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যকালে—'আমরা এখন কলকাতা বিমান বন্দরে নামব' বা 'দিল্লি বিমান বন্দরে অবতরণ করছি' শুনতে পাই। নাম যদি ব্যবহার না হয় তবে দিয়ে কী লাভ। আমি জবাব পেলাম যে নাম ব্যবহার করার জন্য এয়ারলাইনসদের অনুরোধ করা হবে, তার বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। তারপরই আমি লক্ষ করলাম সব প্রাইভেট এয়ারলাইনস নাম উল্লেখ করছে কিন্তু ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস করছে না। অতএব আবার প্রশ্ন করতে হল—ইহা কি সত্য যে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস...ইত্যাদি। দুদিন বাদেই দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরছি ঘোষণা শুনলাম ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এ—'অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বিমান কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করছে' শিশিরকুমার খুবই পুলকিত হয়েছিলেন।

নেতাজি জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে শিশিরকুমার প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর সঙ্গে দেখা করলেন। সেই বৈঠকে আমিও উপস্থিত ছিলাম। উনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন, অন্তত এই জন্মশতবর্ষের আগে আপনারা নেতাজি ভবন-এর কথা চিন্তা করুন। অন্য অনেক ভারতীয় নেতৃবর্গের জন্য কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু নেতাজি ভবন কঠোর সংগ্রাম করে রক্ষা করতে হয়। শিশিরকুমার সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্য এক পরিকল্পনাও পেশ করেন। নরসিমা রাও বলেন তিনি নিশ্চয় এই প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।

এইখানে বলে রাখা ভাল নরসিমা রাও যখনই খবর পেতেন আমরা দিল্লি এসেছি তখনই ডেকে পাঠাতেন, দেখা করতেন। সে সময়ে কখনও উনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী কখনও বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিশিরকুমারের নেতাজি সম্পর্কিত কাজে ওঁর একধরনের শ্রদ্ধা ছিল। সেদিনের বৈঠকে উনি বললেন—এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে উনি নিশ্চয় কিছু করবেন। ১৯৯৬-এর জানুয়ারিতে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল যে এই নেতাজি ভবন সংরক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রকল্পের যে অর্থ প্রয়োজন বলে শিশিরকুমার জানিয়েছেন তার অন্তত অর্ধেক

এখনই অনুমোদন করা হবে। এই আশ্বাস কাজে পরিণত করার আগেই মে মাসে সরকারের পতন হল। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া। ঘটনাচক্রে আমি তখন সাংসদ। আমি রোজই দেবগৌড়ার দুয়ারে ঘুরি—উনি বলেন সিস্টার কোনও চিন্তা কোরো না, এ কাজ হবেই। দেবগৌড়া সরকার টলমল টলমল করতে করতে পড়ে যাবার আগে—যে অর্ধেক অনুদান প্রতিশ্রুত ছিল তারও অর্ধেক অর্থাৎ প্রকল্পের এক চতুর্থাংশ অনুমোদন করে দেন। তারপর গুজরাল সরকার আর কিছুদিন টলমল করে পড়ে গেলেন । নেতাজি ভবনের ভাগ্যে সংগ্রাম করে চলা অব্যাহত রইল। তবুও এই জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শিশিরকুমার যথাসাধ্য সংস্কার, পরিবর্ধন ইত্যাদি করেছিলেন। মাঝে মাঝে উনি বলতেন আমি কি আর রাঙাকাকাবাবুর শতবর্ষ উৎসব দেখে যেতে পারব। দেখে যেতে পেরেছিলেন ও যথাসাধ্য করেছিলেন। শতবর্ষ উপলক্ষে সুগতর সঙ্গে উনি সম্পাদনা করলেন নেতাজির লেখার সংকলন—"Essential writings"—"জরুরি কিছু লেখা"।

চল্লিশের দশকের গোড়ায় মহানিষ্ক্রমণে নেতাজির সাথী হয়ে যে কাজের ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন সহস্রাব্দের শেষে ষাট বছর ধরে একান্তভাবে সেই কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্র ও পিতৃদেব শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার এই মহৎ দায়িত্ব তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষার ঊর্ধ্বে দেশপ্রেমিকের কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই "বসুবাড়ি" বই-এর শেষ পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছিলেন—

"শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসুবাড়ির সন্তান কেবল আক্ষরিক অর্থে। আসলে তাঁরা ভারত সন্তান।—ভারতবাসীর দুঃখকে আপন দুঃখ করে নিয়ে তাদের কল্যাণে তারা জীবন দান করে গেলেন। বসুবাড়ির বন্ধন, বসুবাড়ির অভিমান, বসুবাড়ির গণ্ডি অতিক্রম করে তারা চলে গেছেন অমরত্বের সন্ধানে—"

সেই ইতিহাস বিধৃত করে রাখার কাজে শিশিরকুমার খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের চরম সার্থকতা।

পরিনির্বাণ

শিশিরকুমার চলে গেলেন ২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। এই স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করি অক্টোবর ২০০০ সালে। গোড়ার কথা প্রায় পুরোটাই এরোপ্লেনে বস্টন-লন্ডন-কলকাতা আকাশপথে লেখা। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফার্স্ট ক্লাস বেশ আরামপ্রদ ব্যবস্থা। পড়বার আলো জ্বালিয়ে লিখে চলেছি। চারিদিকে অন্য যাত্রীরা বেশিরভাগ ঘুমন্ত, কেউ কেউ টেলিভিশন স্ক্রিন সামনে বসিয়ে ফিলম দেখছে। মাঝরাত্রে কলকাতা পৌঁছব। স্টুয়ার্ড বললে তুমি সারাপথ লিখতে লিখতে এলে, কত চিঠি লিখলে? আমি বললাম, চিঠি নয়, অন্য লেখা। কী করে বুঝিয়ে বলব এ লেখা ঠিক লেখা নয়, চোখের জলের বিকল্প।

এক মাসও পূর্ণ হয়নি, শিশিরকুমার আমাদের ছেড়ে চেলে গেছেন। মনের ভিতরে এক অনন্ত শূন্যতা, আকাশে-বাতাসে হাহাকার 'নাই ও যে নাই রে'। এই ক'টা দিন কীভাবে কাটল যেন সালভাডর ডালির আঁকা স্বপ্নজগতের ছবি। সেপ্টেম্বরের ত্রিশ তারিখে যখন অকস্মাৎ আঘাত নামল তখন শোকপ্রকাশের সময় নয়। মনে হল শেষযাত্রা যেন সুন্দর হয় দেখতে হবে, জয়যাত্রায় যাও গো গান গেয়ে রওনা করতে হবে। মনে মনে অনেকবার বললাম আমি শোক করব না, আমি চোখের জল ফেলব না। কেন ফেলব? এ তো থ্যাংকসগিভিং-এর দিন। গত দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দুহাত ভরে করুণাময় ঈশ্বর যা দিয়েছেন তার জন্য আমার মন কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। এতখানি দান কী আমার প্রাপ্য ছিল?

সন্ধ্যা আটটা নাগাদ উনি চলে গেলেন। রাত ন'টার মধ্যে আমাদের বসুন্ধরা গৃহ লোকে লোকারণ্য, বেশির ভাগই অজানা, অচেনা, স্বল্প চেনা মানুষ। কে কাকে খবর দিল? এত লোক জানল কী করে? কে বললে টিভিতে সংবাদ প্রচার হয়ে গেছে তারপর লোকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ গতিতে।

মনে পড়ল কিছুকাল আগে আমি একদিন ওকে বলেছিলাম—আমার খুব ভয় করছে। তোমার যদি হঠাৎ কিছু হয় কী করব! আমার তিন ছেলে মেয়ে, প্রবাসী। আমি নিজে একমাত্র সন্তান হবার ফলে চিরদিন একাকী। তোমাদের বৃহৎ পরিবার হলেও কেমন যেন থাকা না-থাকা সমান। আমি তাহলে কী

করব। শ্বেতপাথরের খাবার টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল। উনি খাওয়া থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। "তুমি আমার জন্য ভাবছ? তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। দেশের মানুষ, সাধারণ মানুষ তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে।"

এমন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বললেন যে আমি আশ্চর্য হয়ে রইলাম।

সেই কথাটা সত্য হতে দেখলাম ৩০ অক্টোবর ২০০০ সালের সেই রাত্রে। দোতলা থেকে ওকে নামিয়ে নীচের পশ্চিমের ঘরে শোয়ানো হল। এ বাড়িতে অল্পদিন আগেও ওঁর চেম্বার রুগি দেখার ঘর ছিল এটি। সেখানে পুরনো দিনের বিরাট পালঙ্ক, বাবা-মা শরৎচন্দ্র ও বিভাবতীর বিবাহের যৌতুক। এই পালঙ্কে একটি ঐতিহাসিক ছবি আছে সুভাষচন্দ্র ও বালক শিশিরকুমারের। মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সুভাষচন্দ্র শুয়ে আছেন খাটে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে বালক শিশির। পিছনে কারুকার্যখচিত পালঙ্ক ইংরেজি SB শরৎ বসুর আদ্যক্ষর দেখা যাচ্ছে। সেই খাটেই শেষশয্যায় শায়িত শিশিরকুমার, পিছনে সেই একই কারুকার্য।

ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠে প্রথম ফোন করলাম ডাক্তারকে। বেশ দৃঢ়ভাবে বললাম, যা ঘটবার তা ঘটে গেছে আর কিছু করার নেই, তবু আপনি আসুন। জবাব এল, এখুনি আসছি। দ্বিতীয় ফোন বস্টনে সুগতকে। গলা একটুও কাঁপল না বললাম তুমি স্থির থেকো, উই হ্যাভ লস্ট বাবা—আমরা বাবাকে হারিয়েছি।

আমাদের কন্যা শর্মিলা তখন আকাশে কলকাতা থেকে মুম্বাইয়ের আকাশপথে। মাত্রই কয়েকঘণ্টা আগে বসুন্ধরার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমি ও শিশির ওকে গুডবাই বলেছি। তিন শিশুপুত্র নিয়ে সে বিমানবন্দরের পথে রওনা হয়ে গেছে। আমার মনটা ওর জন্য ব্যস্ত হয়েছিল, একা যাচ্ছে তিনটি শিশু নিয়ে। পাশে দাঁড়ানো শিশিরকুমারের দিক থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা মনেও আসেনি। সুমন্ত্র তাকে ছাড়তে গিয়েছে।

ব্যালকনি থেকে এসে বসবার ঘরে সোফায় বসে উনি বললেন, 'চলো, এই উইক এনড্‌টা তুমি আর আমি টলি ক্লাবে কাটিয়ে আসি' এই ইচ্ছাটা উনি কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝেই ব্যক্ত করছিলেন। বলছিলেন, তোমাকে তোমার লোকসভা কেন্দ্রের লোকজন সব সময়ে ব্যস্ত করছে আর আমারও রুগিদের হাত থেকে নিস্তার নেই। চলো চুপি-চুপি টলি ক্লাবে কোনও একটা উইক এনড্ কাটিয়ে আসি।

তবে ওর এই শেষ ইচ্ছাটা আর পূর্ণ হয়নি।

সেদিনের সন্ধ্যার ঘটনা কেমন যেন এলোমেলো ভাবে আমার মনের মধ্যে

গেঁথে আছে। চেম্বারে রুগি দেখে খুব ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন, আমি দেখলাম। ইদানীং এইভাবেই উঠতেন, কষ্ট হত, না সাবধানতার জন্য ঠিক জানা নেই। ক্লান্ত দেখিয়েছিল কি? মনে হয় না। রোজকার মতোই স্বাভাবিক। আমি নানা অকাজে ব্যস্ত, বসবার ঘরেই কী যেন করছি। উনি টিভি-র ঘরে গেছেন। সাতটার খবরটা মন দিয়ে শুনতেন। পরে শুনলাম আমাদের বহুদিনের পরিচারিকা অমলা রোজকার মতোই আপেল কেটে সামনে দিয়েছে। ডাক্তারের আদেশে ফল খেতে হবে।

এক সময়ে দেখলাম উনি আমার সামনে দাঁড়ানো। মুখটা একটু শুকনো, স্বাভাবিক ঝকঝকে চেহারার বদলে মুখটা একটু কালচে, চুল উসকো খুসকো। হয়তো জিজ্ঞাসা করতাম শরীর খারাপ লাগছে না তো? কিন্তু তার আগেই উনি আমাকে বললেন, মমতা তো একটা কাণ্ড বাঁধিয়েছে! কী হয়েছে? আমার প্রশ্ন।

উনি বললেন মমতা মন্ত্রিসভা থেকে রিজাইন করে গেছে। পেট্রোল ও কেরোসিনের দাম বাড়ানো চলবে না এই দাবিতে।

অ্যাঁ—মুহূর্তের মধ্যে আমার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা হল না। সত্যিই কি খারাপ দেখেছিলাম? না আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে কল্পনা করছি? সঠিক বলতে পারি না। আরও দু' চারটে কথা কি হয়েছিল না হয়নি? কী জানি মনে পড়ে না।

হঠাৎ দেখলাম সুমন্ত্র হন্তদন্ত হয়ে কাগজপত্র হাতে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও কখন বিমানবন্দর থেকে ফিরল? পিছন থেকে ডেকে বললাম—শুনেছ বাবা টিভি-তে নিউজ দেখেছেন মমতা তো...ইত্যাদি।

ও এক মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে বলল—'তাই নাকি! স্টার টিভি তোমাকে ধরল বলে—'

সুমন্ত্র দরজার বাইরে গিয়েছে কি যায়নি টেলিফোন বাজতে লাগল ঝনঝন। ওপারে দিল্লি থেকে স্টার টিভি-র বরখা দত্ত। জানতে চায় আমার বক্তব্য। আমার কিছু বলার নেই, এইমাত্র তো শুনলাম। টেলিফোন রাখতেই আবার বেজে উঠল—কলকাতার স্টুডিও থেকে মনিদীপা। ওকে একই জবাব দিয়ে মমতাকে ফোনে ধরলাম। ও সংক্ষেপে আমাকে যা বলার বলল। ফোন রাখতে আবার ফোন। কী জানি কেন দুটো ফোন দুহাতে ধরে আছি। একটাতে দিল্লি স্টার টিভি থেকে বিক্রম চন্দ্র—প্লিজ, একটু কলকাতার স্টুডিওতে আসুন, গাড়ি পাঠাতে বলছি।

পরে শুনেছিলাম অন্য ফোনটাতে সুমন্ত্র ছিল নেতাজি ভবনে। আমি ডেকেছিলাম? ও বলেছিল তুমি অন্য ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বললে—তারপর এমন একটা হইচই শুরু হল কিছু বুঝলাম না।

অমলা এসে আমাকে বলল, মা একটু এসো তো? সাহেবের বাথরুমে শাওয়ারে জল পড়ার আওয়াজ হচ্ছে—কিন্তু এখনও তো বার হলেন না। আমার বুকের ভিতর ধক্ করে করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে মনে হল যা হবার হয়ে গিয়েছে।

যখন ধরাধরি করে এনে ছোট ঘরে বিছানায় শোওয়ানো হল দেখলাম বেশ ঝকঝকে চেহারা, ক্লান্তি কই? মুখে দিব্য বিভা, শান্ত সৌম্য ভাব। হাত থেকে হাতঘড়িটা কে যেন খুলে নিল, বাথরুমের মাটিতে পড়ে থাকা চশমা কেউ নিয়ে এল। না শাওয়ার খোলা ছিল না। হাত ধোবার বেসিনের কল খোলা ছিল, তারই কুলুকুলু আওয়াজ বাইরে থেকে শোনা গেছে।

চেয়ে দেখলাম চারিদিকে বহু মানুষ। মমতা এসে দাঁড়িয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে ভার নিয়ে নিয়েছে, সেনাপতির মতো চালনা করছে সকলকে। অনেক টিভির আলো, খবর কাগজের লোকজন। কাকে যেন আমি বললাম—প্লিজ, মৃত্যুর ছবি তুলবেন না, উনি যেমন ছিলেন জীবনে তেমন মনে রাখতে দিন। ওরা তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা বন্ধ করলেন।

নীচে নিয়ে চলে যাবার পর কোনও এক সময়ে মমতা এসে বলল—কৃষ্ণাদি, ছবি তোলার অনুমতি দিন—সারা দেশের মানুষ দেখতে চাইবে।

কোন এক সময়ে এক কাপ কফি হাতে মমতা আমার পিছনে ঘুরছে দেখলাম। সৌগত আর ডলিকে দেখতে পাচ্ছি, ডলি দুটো বালিশ হাতে আমাকে সোফায় পা তুলে আরাম করে বসাবার চেষ্টা করছে। নয়নাকে দেখছি, করুণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ও শিশিরদাকে ওর দিল্লির বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হলে ধরে নিয়ে যেত। হয়তো হোলি খেলবে বলে আমার দিল্লির ফ্ল্যাটে আবির হাতে হাজির। মাঝে মাঝে মমতার কাছে ধমক খেত—শিশিরদার সঙ্গে ছেলেমানুষি করবে না। 'বা রে পায়ে একটু আবির দেব না?'—নয়নার প্রতিবাদ।

কোনও এক বিবাহবার্ষিকীতে আমরা দুজনে দিল্লিতে ছিলাম। মমতা ফুল, মিষ্টি, উপহার নিয়ে হাজির—সঙ্গে সুদীপ, নয়না আরও যেন কারা। আমি আকবর কোথায় ভাবছি। দেখি ও দরজার আড়ালে দুটো মোটা ফুলের মালা হাতে ধরে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। মমতা ওকে বকেছে—শিশিরদাকে মালা দেওয়া—গুরুজন না? মমতা সরে যেতে আমি ওকে ডাকলাম—ও এসে মালা দুটো পরিয়ে দিল—শিশিরদা খুশিই হলেন, গুরুজন তো কী হয়েছে!

সুব্রত মুখার্জি নতুন মেয়র হয়েছেন। বললে কৃষ্ণাদি শিশিরদাকে নিয়ে যাই টাউন হলে—এখানে এত ভিড় অসুবিধা হবে। আমি বললাম না—একমাত্র জায়গা যেখানে উনি যাবেন তা নেতাজি ভবন। সবাই এক কথায় রাজি। কাল

সকালে সবাই সেখানে সমবেত হবে।

সুব্রতকে পেয়ে আমি একটা অনুরোধ করলাম—একটু দেখবে শ্মশান যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে যাতে মর্যাদার সঙ্গে শেষযাত্রা হয়। আমাদের শ্মশানের যা অবস্থা মানুষ শান্তিতে মরতেও পারে না। সুব্রত, মালা অন্যান্য কাউন্সিলররা ভার নিল। পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর পরিবেশ বজায় ছিল। আমার সাদা ফুল ভাল লাগে না শুনে সাদা ফুলের পাহাড়ের ওপর মমতা লাল গোলাপের ফুলের মালা রাখার ব্যবস্থা করল। পঁচিশটি ছোট ছোট মেয়ে গোলাপ ফুল ছড়িয়ে দেবে শেষ সময়ে তাও ঠিক হল।

মমতা এসে বললে কৃষ্ণাদি আপনি ওপরেই বসুন, নীচে খুব ভিড়, যারা চায় ওপরে এসে দেখা করে যাবে। আমি বললাম, আমি আজকের রাত নীচে ওই ঘরে ওর সঙ্গে থাকব। পঁয়তাল্লিশ বছরের একসঙ্গে থাকা—কাল থেকে আর তো হবে না। মমতা পরে বলেছিল আমার কথা শুনে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি খাটে বসলাম, ওর পাশে। মণি (প্রমিতা) এসেছে—পাশে দাঁড়িয়ে গান ধরল। গানে পরিবেশ যেন শুদ্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গান যেন গান তো নয় মন্ত্রোচ্চারণ।

একতলার অন্য ঘরে তখন নানান ঘটনা ঘটে চলেছে। মমতার মন্ত্রিসভা থেকে হঠাৎ পদত্যাগে দিল্লিতে একটা সংকট ঘনিয়েছে। আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে লোকজন ও সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ এসে পৌঁছেছেন মমতার বাড়ি। মমতা বলে পাঠিয়েছে এখন ওর পক্ষে এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কালকের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা নিয়ে ও ব্যস্ত আছে। ফলে সেই রাত্রে সুধীন্দ্র কুলকার্নি, জর্জ ফার্নান্ডেজ সকলে শোকের বাড়িতে উপস্থিত। আমার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে শোক জ্ঞাপন করে তারা পাশের ঘরে সংকটমোচনের জন্য সভা করছেন।

এরই মধ্যে সুগতর ফোন এল বারকতক। তার পাসপোর্ট জার্মান কনসুলেটে জমা আছে কারণ ওর বার্লিন যাবার কথা ছিল। এখন পাসপোর্ট উদ্ধার করার আগে দেশে আসা অসম্ভব। ওকে বলা হল দেরি হলে কিছু করার নেই। আমরা সকালে শর্মিলা ও অ্যালানের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সেই রাত্রের মধ্যে জার্মানরা ছুটির দিনে কনসুলেট খুলে পাসপোর্ট বার করে দিয়েছিল কিন্তু ততক্ষণে ওর ফ্লাইট মিস হয়ে গেছে।

সকল রাতের মতো সেই রাত্রিও ভোর হল। অমলা বসেছিল সারা রাত আমার সঙ্গে। ভোরের দিকে দুজনেই ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের আকাশে তাকিয়ে মনে পড়ল—"এই পৃথিবী যেমন ছিল তেমনি রবে, সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে।" মনে হল টুকুল কলকাতায় থাকলে এই

বাউল গানটি শুনতে চাইতাম। লন্ডনে যেবার উনি উনি অসুস্থ হয়ে মাঝরাত্রে সেন্ট চার্লস হাসপাতালে ভর্তি হলেন সে রাতও আমি বিছানার পাশে একটা সোফায় আমার কানি শাল গায়ে দিয়ে রাত কাটিয়েছিলাম। উঁচু একটা জানালায় ধীরে ধীরে লন্ডন শহরের ভোরের আলো ফুটে উঠতে দেখলাম। সেদিনের ভোরে আশা ছিল। এখন চিরতরে যবনিকা পতন।

ভোরের আলো হতে আরও বহু মানুষের ভিড়—মনিয়া আর সলিল। ইনস্টিটিউটের ডাক্তারদের ভিড়—অপূর্ব মেরহোত্রা, উমাশঙ্কর। কে যেন বলল পেসমেকার খুলে নিতে হবে। ডাক্তারেরা তার ভার নিল। সুমন্ত্র অনেক কিছু সামলাচ্ছে মনে হল। গভীর রাতে তার নিজের হঠাৎ শরীর খারাপ হল, মাথা ঘুরল। কী ব্যাপার জানি না, প্রায় একই সময়ে সুগতও বস্টনে অসুস্থ হয়ে পড়ল। মাথা ঘুরছে। রওনা হতে পারবে কিনা—নিজেও ঠিক করতে পারছে না। বেলায় শর্মিলা আর অ্যালান এসে পৌঁছল। কাচের গাড়ি যথাসময়ে হাজির। বাইরে নিয়ে যাওয়ার গেটের কাছে দর্শকের ভিড়—আমরা মা ও মেয়ে শান্তভাবে একবার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। বহু মানুষের সামনে ভেঙে পড়া চলবে না। বসুন্ধরা গৃহ থেকে শিশিরকুমারের শেষ যাত্রা শুরু হবার সময়ে শর্মিলা গান ধরল—"ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ভেসে আসে—"

কাচের গাড়িতে ফুলের শয্যায় এবার নেতাজি ভবনে প্রবেশ। এ কী ধরনের প্রবেশ। কেমন যেন অবাস্তব মনে হয়। যেখানে জীবনের প্রতিটি দিন একবার অন্তত আসতেই হত, নিজের হাতে তিল তিল করে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান। সেখানে এই ভাবে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়ে আসা। মণি, তপন শর্মিলা গাড়িবারান্দায় শবাধারবাহী গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে একটার পরে একটা গান গেয়ে চলেছে। গীতবিতানের পূজার গান সব শেষ।

এখানে বহু মানুষের জটলা।

সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মেয়েরা গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন। নেতাজি ভবনের সিঁড়িতে বসে আছি। বহু মানুষ সার দিয়ে এসে মালা বা ফুল দিয়ে ঘুরে কাঁচের গাড়ির ওপাশ থেকে চলে যাচ্ছেন। সুশৃঙ্খল ভাবে হয়ে যাচ্ছে সব। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ চেনা মুখ নজরে পড়ছে। নবনীতা একটা মালা হাতে দাঁড়ানো, পঙ্কজ (সাহা) কোথা থেকে এল? ও তো এখন শান্তিনিকেতনে। আরে, হীরেন চক্রবর্তী অনেকদিন পরে দেখছি। বেশ কিছু রাজনীতিক বিভিন্ন দলের মালা দিচ্ছেন। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে কাঁচের গাড়িতে ওর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না, একটা বিরাট ফুলের তোড়া পথ আটকে আছে। আমি বললাম, ফুলটা একটু সরিয়ে দেবে। এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি

চিরনিদ্রায় শায়িত শান্ত, সৌম্য মুখশ্রী। মনে মনে আইরিশ প্রার্থনা উচ্চারণ করি—May God hold you in the palm of his hand till we meet again. নেতাজি সুভাষচন্দ্র তার স্ত্রী আমাদের কাকিমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"যদি এ জীবনে আর দেখা না হয় পরজন্মে আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব—" সত্যি কি তা সম্ভব? কেউ জানে না। মানুষ জীবনের রহস্য এত কিছু আবিষ্কার করেছে, এমন কী কৃত্রিম উপায়ে প্রাণও সৃষ্টি করতে পেরেছে কিন্তু মৃত্যুর দুয়ার পার হলে ওপারে কী কেউ বলতে পারেনি।

শিশিরকুমারের জীবন তার রাঙাকাকাবাবুর প্রতি উৎসর্গ করা ছিল। প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন রাঙাকাকাবাবু ফিরে এসেছেন। আমাকে বলতেন—'জানো স্বপ্ন দেখলাম একটা অচেনা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেন এসে থামল, ট্রেনের কামরা থেকে রাঙাকাকাবাবু নেমে এলেন।' এই স্বপ্ন একবার নয় বহুবার দেখেছেন। সেই যে ১৯৪১ সালের এক জানুয়ারি রাত্রে গোমো স্টেশনে দিল্লি-কালকা মেলে সুভাষচন্দ্রকে তুলে দিয়েছিলেন, আর দেখা হয়নি। যোগাযোগ ছিল ১৯৪৩-এর শেষ পর্যন্ত কিন্তু চাক্ষুষ দেখা আর হয়নি। সেই দেখা-না-হওয়ারই প্রতিফলন হত এই ইচ্ছাপূরণ স্বপ্নে।

হঠাৎ কেমন মনে হল তবে কি অন্য কোনও গ্রহে, কোনও অচেনা প্ল্যাটফর্মে দুজনে আজ দেখা হল!

আমার হাতে হাতফোন ধরিয়ে দিল কেউ দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ফোন করছেন। চারিদিকে গানের মধ্যে খুব ভাল শুনতে পাচ্ছি না। উনি সমবেদনা জানালেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের কথা বললেন। তারপর নিজের কথাও বললেন—আমার শরীরটা বেশ খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি হতে যাচ্ছি, হাঁটুর অপারেশন করাতে হবে জানো তো। দেখি কী হয়!

রব উঠল দেরি হয়ে যাচ্ছে এবার রওনা হতে হয়। নেতাজি ভবনের গাড়িবারান্দা থেকে কাঁচের গাড়ি শিশিরকুমারকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।আমি আমার ছোট গাড়িতে পিছনে যাচ্ছি। আমার গাড়ি খুবই ধীর গতিতে যাচ্ছে। কী ব্যাপার এত ধীরে কেন? শুনলাম সামনে বহু মানুষ হেঁটে যাচ্ছে—তাই শ্লথ গতিতে গাড়ি চলছে। একটা স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রা চলেছে, পথে আরও লোক যোগ দিচ্ছে। পথের দুপাশের বহু মানুষ দাঁড়ানো, তারা আমার দিকে সমবেদনার দৃষ্টিতে দেখছে। এক সময়ে শোকযাত্রা থামল।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম শ্মশান ঝকঝক তকতক করছে, আয়োজন প্রস্তুত। একটা পাথরের বেঞ্চিতে একাকী বসে আছি, অ্যালান তাড়াতাড়ি পাশে এসে বসল। অন্যরা সকলে উঁচু বেদিতে দেহ ঘিরে দাঁড়াল—সুমন্ত্র, শর্মিলা, প্রমিতা,

তপন। আমার স্বল্পকালীন রাজনীতিক জীবনের অনেক সহকর্মী, লোকসভা কেন্দ্রের বহুমানুষ বেহালা, কবিতীর্থ, যাদবপুর, বিষ্ণুপুর, মগরাহাট বারুইপুর—সকলে আমার চারপাশে দাঁড়ানো। খুব ভাল লাগছে যে গান থামেনি—গান চলছে বেদির উপর। এবার শেষ গান কানে এল—আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে/এ জীবন পুণ্য করো...

অনেকে যোগ দিয়েছে গানে, সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এ জীবন পুণ্য করো...

হঠাৎ গান ছাপিয়ে দ্রাম করে একটা আওয়াজ কানে এল, চমকে উঠলাম। বুঝলাম সব শেষ। অগ্নিতে প্রবেশ করিয়ে দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর কোনদিন ওই চেহারা দেখব না। প্রাণ না থাকলে দেহ কিছু নয়। দেবী দুর্গার বিসর্জন মন্ত্র পড়া হয়ে যাওয়ার পর খড় ও মাটির প্রতিমা আর দেবী নয়—জলে বিসর্জন দিয়ে দেওয়া রীতি. তবু মেনে নিতে কেমন লাগে—আর কখনও দেখব না—আমার কাছে যা ফিরে আসবে তা ভস্মীভূত দেহাবশেষ। অ্যালান বললে—লেট আস গো হোম—চলো আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

ছেলেমেয়েরা স্থির করেছে তারা মৃত্যুকে অস্বীকার করবে। মৃত্যুকে ঠিক অস্বীকার করা যায় না, অন্তত মৃত্যুর কাছে নতজানু হবে না। শিশিরকুমারের জন্য যে স্মরণসভা হতে চলেছে তাকে স্মরণসভা বলা হবে না—সে হবে সেলিব্রেশন অব হিজ লাইফ—তার জীবনের উৎসব। সুগত কলকাতায় পৌঁছবার পর তাকে বেশি দেখতে পাচ্ছি না—সে এই জীবন ও কর্মের উৎসব—নতুন ধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলির আয়োজনে ব্যস্ত। মালটিমিডিয়া প্রেজেনটেশন হবে—ছবি, ফিলমের টুকরো, গান, কবিতা, বক্তৃতা সব মিলিয়ে শিশিরকুমারের বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা উপস্থাপিত করা হবে। শর্মিলা গানের দিক দেখছে। সুমন্ত্র কবিতা নিয়ে পড়েছে। শিশিরকুমার কবিতা লিখতেন অনেকের সেটা অজানা ছিল। 'উত্তরাধিকার' বা 'কাজ চলছে', এমনি দু'একটি কবিতা মূল বাংলা ও ইংরাজি অনুবাদ সুমন্ত্র রেকর্ড করে রাখছে।

কোনও ধর্মীয় আচার পালন করা হবে না এ কথা আগেই ঠিক ছিল। দশ দিনের মাথায় আমরা আমাদের নিজস্ব রীতিমতো পূজা ও গানের আয়োজন করলাম সকালে। যেমন হয়, পূজার ভার সবসময়ে সলিল ও মনিয়ার। আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। একমনে জপে যাচ্ছি শুধু থ্যাংকসগিভিং—"অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি—' 'আমি যাহা চাই সকলি পেয়েছি'...'শোক নয়, দুঃখ নয়।'

পরে শুনেছিলাম সুগত হঠাৎ ভেঙে পড়েছিল। ছোট্ট টিপু তাকে অনেক

সান্ত্বনা দিয়েছে।

তারও আগের দিন আমরা দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে গিয়েছিলাম। শিশিরকুমার বিশ্বাসী ছিলেন না, নাস্তিক ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। সেই যে মহানিষ্ক্রমণের আগে শিশির ও ইলাকে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে মায়ের কাছে পূজা দিতে পাঠিয়েছিলেন সেই থেকেই এই আকর্ষণ কি না কে জানে। মাঝে মাঝেই আমরা মন্দিরে গিয়েছি, মন্দিরের কর্তৃপক্ষও অনেক অনুষ্ঠানে আহ্বান করেছেন শিশিরকুমারকে। সেদিন আমি, সুগত শর্মিলা ও সুমন্ত্র মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখলাম পূজার সব আয়োজন ওঁরা প্রস্তুত করে রেখেছেন। শাস্ত্রমতে আমি ও দুই পুত্র এখন মন্দিরে প্রবেশ করতে পারব না—অশৌচ চলছে। আমরা যাতে বাইরে থেকেও সুন্দরভাবে মাতৃদর্শন করতে পারি তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শর্মিলা বিবাহসূত্রে অন্য পরিবারের তার কোনও বাধা নেই। সে মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার উপাচার উৎসর্গ করল।

দেখতে দেখতে তেরো তারিখ সেলিব্রেশন অব হিজ লাইফ—শিশিরকুমারের জীবন ও কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির দিন উপস্থিত। স্থির হয়েছিল কোনও বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার প্রয়োজন নেই, খ্যাতনামা কারও অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রয়োজন নেই। অনাড়ম্বর অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ হবে অনুষ্ঠান। যারা অন্তরঙ্গ ছিলেন তাদের দু'একজন দু'এক কথা বলবেন। তারপর ছবি ও গানের মাধ্যমে সুগত ও শর্মিলা তুলে ধরবে জীবন। সুমন্ত্র উপস্থিত নেই, কিন্তু তার কণ্ঠে তার পিতৃদেবের কবিতার আবৃত্তি ধরা আছে।

প্রথমেই উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরল টুকুল—আমার প্রিয় বাউল গান—'সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন বলে যেতে হবে...।' তারপর মঞ্চে এল সুমন। সে আমাদের পুত্রতুল্য। তার শ্রদ্ধেয় মেসোমশাই সম্পর্কে তার অন্তরের কথা সহজ কথায় বলল সে। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের পক্ষে বললেন সাধন কর। বিশেষ করে স্মরণ করলেন স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে নেতাজির ভাবধারা বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে অনলস প্রচেষ্টা তিনি করে গিয়েছেন সে কথা। তরুণ ডাক্তারদের পক্ষে বলতে উঠল অপূর্ব। তাদের চিকিৎসক জীবনের পথপ্রদর্শকের কাছে তাদের ঋণ স্মরণ করল সে।

সুগতর মালটি-মিডিয়া প্রেজেনটেশনের মাধ্যমে শিশিরকুমারের শৈশব, বাল্যকাল যৌবন ফুটে উঠছে পর্দায়। স্বাধীনতা সংগ্রাম, কারাবরণ, বিলেতে ডাক্তারি পড়া...। কোন এক সময়ে দেখলাম আমাদের বিবাহের আনন্দময় কিছু মুহূর্ত ধরা পড়ছে। নেতাজি ভবনে সুভাষচন্দ্রের উত্তরাধিকার ধরে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে চলেছেন শিশিরকুমার। শর্মিলার গলায় 'তোমার পতাকা

যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।' সুগত ধারাভাষ্য পাঠ করছে তার মধ্যেই তার গমগমে গলায় 'শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল' গেয়ে উঠল।

নেতাজি ভবনের পিছনের প্রাঙ্গণে সামিয়ানার তলায় বহু লোক। বসতে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। গাড়ি-বারান্দা ছাপিয়ে গেট পর্যন্ত লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এত ভিড়ের মধ্যে আমার খুব একাকী বোধ হচ্ছে। যখন এসে পৌঁছলাম আমার মনে হল এই প্রথম আমি একা প্রবেশ করছি। সেদিন যখন কাঁচের গাড়ির পিছনে এলাম তখনও যেন দুজনেই ছিলাম।

গাড়ি থেকে নেমে যখন নেতাজি ভবনে ঢুকছি আমার সাত বছরের দৌহিত্র টিপু এসে আমার হাত ধরে নিয়ে চলল। এখনও আমার দু'পাশে বসে আছে দুই দৌহিত্র, টিপু একদিকে, অন্য দিকে চার বছরের টুংকু। শিশুমনে মৃত্যু বা বিচ্ছেদ কী প্রভাব ফেলে কে জানে। তাদের মতো করে তারা আমাকে দুঃখ থেকে ঘিরে রাখার চেষ্টা করছে। মঞ্চের উপর পর্দায় ভাসছে ছবি আমি আর শিশিরকুমার নেতাজির শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, বারান্দার ওপর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে যে পথে সুভাষচন্দ্র অতিক্রম করেছিলেন মহানিষ্ক্রমণের মধ্য রাতে। সুগত নাম দিয়েছে In freedom's foot steps for ever —। শর্মিলার গলায় তখন শেষ গান শোনা যাচ্ছে—তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ, তোমারি তরে মা সঁপিনু এ প্রাণ।

আমার চারিদিকে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, মেসেজের স্তূপ। ই-মেল খুললে দেশবিদেশ থেকে মানুষের সমবেদনা। দলমত নির্বিশেষে এত মানুষের ভালবাসা শিশিরকুমারের জন্য সঞ্চিত ছিল? রাষ্ট্রপতি নারায়ণনের কাছ থেকে দীর্ঘ পত্র এল স্বাধীনতা সংগ্রামে শিশিরকুমারের ভূমিকা, বিশেষ করে নেতাজির মহানিষ্ক্রমণে সাহসী সারথি, তারই সঙ্গে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা—নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো ও কলকাতার শিশু হাসপাতাল সবই স্মরণ করেছেন। গভর্নর বীরেন শাহ অল্পদিন কলকাতায় রাজ্যপাল হয়ে এলেও দুবার এসে গিয়েছেন নেতাজি ভবনে, দেখে এসেছেন শিশু হাসপাতাল, যথেষ্ট পরিচিত হয়েছিলেন শিশিরকুমারের সঙ্গে। দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি সকলের চিঠিতে আন্তরিকতার সুর। একটি স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ ও বর্তমান তার মধ্যে এক সেতুবন্ধনের মতো ছিলেন শিশিরকুমার। শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধির চিঠিতে ছিল সমবেদনা—স্বামী হারানোর শোক কত বড় আঘাত তা তিনি মর্মে মর্মে জানেন। কত বাবা-মাদের চিঠি যাদের শিশু সন্তানদের উনি দেখাশুনো করেছেন। জাপান থেকে চিঠি তারা প্রার্থনা করছে আত্মার শান্তির জন্য।

বছরখানেক আগে যখন শিশিরকুমার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে মুম্বাইতে তখন জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরে তাঁর জন্য প্রার্থনা হয়েছিল, সুদূর টার্কিতে মসজিদে প্রার্থনা হল, পাকিস্তানের স্বজনেরা তো আছেনই। আর কলকাতার কাছে দক্ষিণেশ্বরে ওঁর আরোগ্য কামনা করে পুজো হয়েছিল। এবারের আঘাত এত আকস্মিক কেউ জানতে পারেননি।

রাজনীতিক মতামতের ঊর্ধ্বে উঠে বহু মানুষ তাদের শোক জানিয়েছিলেন। খুব ভাল লেগেছিল—বিমান বসুর চিঠি, বিনয় কোঙারের পত্র, বন্ধুবর অশোক মিত্র লিখলেন এরকম সজ্জন আর হবে না। পবিত্র সরকার মহাশয় লিখলেন একই কথা—এরকম বিরল ব্যক্তিত্ব আর হবে না। সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায় সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি ছিল ওঁর জন্য। নেতাজি ভবনে শায়িত থাকার সময়ে সকল রাজনীতিক দলের বিশিষ্ট জন ফরোওয়ার্ড ব্লক, আর.এস. পি.—শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন।

আমার অন্তর স্পর্শ করল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গুজরালের চিঠি, একান্ত বন্ধু চলে গেলেন একজন। এক একটি চিঠি মনে খুব জোর এনে দেয়—অমর্ত্য সেনের মা আমার শ্রদ্ধেয়া আশ্রমকন্যা অমিতা সেন লিখলেন—'তোমাকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্ধা আমি রাখি না—সান্ত্বনা তোমাকে দেবেন স্বয়ং ঈশ্বর—সেটা তুমি পাবে কিন্তু সাথীহারা জীবনকে যে মেনে নিতে সময় লাগবে তোমার সেটা অনুভব করে মন আমার কাঁদছে।'

এই সাথীহারা জীবনকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা আমার শুরু হল। সুগত বললে, আমার সঙ্গে বস্টন চলো, কলকাতায় মন খারাপ হবে। রাষ্ট্রসংঘের মিলেনিয়াম সেশনে আমার যোগ দেবার কথা ছিল। সাহসে বুক বেঁধে রওনা হলাম। নিউ ইয়র্কে অপেক্ষা করছেন আমাদের পার্মানেন্ট মিশনের বন্ধু ও অফিসাররা সকলে।

বস্টনে আমার ও শিশিরকুমারের প্রথম সংসার-জীবনের শুরু। নবীন সংসারী আমরা। বস্টনে এসে পুরনো সেই দিনের কথা কেবলি মনে পড়ে, ভুলি কেমনে? মনে মনে দেখতে পাই—শিশিরকুমার চলেছেন বস্টন শিশু হাসপাতালে কাজে। আমি এক নিতান্ত অল্পবয়সী তরুণী ঘর সংসার করছি। সঙ্গে শিশুপুত্র, কন্যার জন্ম হল বস্টন লাইং-ইন-হাসপাতালে। বস্টনে এসে কষ্ট আরও বাড়ল।

নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করলাম। আমাদের পার্মানেন্ট মিশনের অ্যামবেসেডর কমলেশ শর্মা থেকে শুরু করে সতীশ মেহতা, সত্য পাল, মহিলা কনসাল জেনারেল শশী ত্রিপাঠি, বিজয়া ঠাকুর সিং সকলে, এই সদ্য শোক থেকে উঠে আসা আমাকে আপ্রাণ সহায়তা করে

গেলেন। দুদিন দুটি সেশনে বক্তব্য রাখতে হল। তৃতীয় দিনে সিকিওরিটি কাউন্সিলে বিতর্কে অংশ নিলাম। বিষয় ছিল—উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিওরিটি—। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে অবাস্তব মনে হল। কাজ করছি, মিটিং করছি, বক্তৃতা করছি আর হৃদয়ের অভ্যন্তরে কোথায় যেন টপটপ করে রক্তবিন্দু ঝরে পড়ছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে হবে, একাকী এই জীবন মানিয়ে নিতে হবে—নিজেকে বলে চলেছি। বস্টনে সুগত আছে, নিউ ইয়র্কে লেনি গর্ডন আছে। লন্ডন থেকে সুমন্ত্র সাহস জোগাচ্ছে, কলকাতায় শর্মিলা মাঝে মাঝে নিজেই ভেঙে পড়ছে, কখনও আমাকে শক্ত থাকতে বলছে। ই-মেলে পাঠানো কবিতার মধ্যে একটি অনুবাদ করলাম—একটি বৃক্ষের পতন। বস্টন-কলকাতা আকাশপথে লিখতে শুরু করলাম ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিকথা।

শিশিরকুমার চিরদিন সুখে দুঃখে অবিচল ছিলেন। মা-জননী প্রভাবতী শরৎচন্দ্র বসুকে বলেছিলেন, শিশির যোগভ্রষ্ট ঋষি। ইংরেজের কারাগারে নীরবে অত্যাচার সহ্য করার শক্তি দেখে শরৎচন্দ্র বসু মন্তব্য করেছিলেন, মা-জননী ঠিক কথাই বলেছিলেন।

কিন্তু আমি সহজে বিচলিত, সাধারণ মানুষ। আমার সাথীহারা জীবন মানিয়ে নেবার সংগ্রাম কঠিন হবে। শিশিরকুমার ও আমি যে তরণীখানি একদিন সুখে দুঃখে শোকে আঁধারে আলোকে অমৃতের সন্ধানে ভাসিয়েছিলাম—সে যাত্রার কিছু খণ্ড স্মৃতি চিত্র রয়ে গেল এই কাহিনীতে—।

শিশিরকুমার বসুর কয়েকটি কবিতা

দৃষ্টি

কে বলে দৃষ্টি কেড়ে নিলে
দেখা যায় কম।
এই তো সেদিন ডাক্তারে
অস্ত্র চালিয়ে কী একটা
করল ম্যাজিক,
ভাবলাম বুঝি জগৎটাই
গেল বদলে,
তা তো নয়
দেখলাম আমার শয্যার পাশে
কে ও দাঁড়িয়ে?
ঐ তো সেই আটত্রিশ বছর
আগের আমার নববধূ
সত্যিই তো দাঁড়িয়ে, স্বপ্ন নয়
দৃষ্টি তো বেড়ে গেল।

জানুয়ারি ১৯৯৪-এ চোখ অপারেশনের পর।

কাজ চলছে

ব্যাপারটা ঘটেছিল শীতের এক দুপুরে,
আমার ডাক পড়ল, কাছে বসতে বলে
জিজ্ঞাসা করলেন, আমার একটা কাজ আছে,

করতে পারবে?
স্নিগ্ধ শান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিলেন
আমার জবাবের আশায়,
আমি কীই বা বলব!
কী কাজ? চিঠি ডাকে দিতে হবে?
টেলিগ্রামের খসড়া করতে হবে?
অথবা কোন অতিথিকে দেখাশোনা?
না, এক গোপন কাজ, এক গোপন যাত্রার
সাথী হতে হবে, কেউ জানবে না!
জানবে শুধু ইলা।
তাই তো, এ আবার কী কাণ্ড কারখানা?
মনে পড়ল বছর দুয়েক আগে
বাবা বলেছিলেন
ছেলেটা সুভাষের পাল্লায় পড়েছে,
কথাটা ফলে গেল না কি!
সেই তো কাজের শুরু, কাজ চলছে,
কাজ চলবে।

ভয়

তোমরা সব ভয়ে ভয়ে আছ
কী জানি কী হয়,
কীই বা হবে
এত পথ তো চলে এলাম
কত ভয় পেছনে ফেলে রেখে,
মা খুবই ভয় পেতেন
বাবাও
কীই বা হল
বাকি যেটুকু আছে
চলে যাব ভয়শূন্য পথে।

বম্বেতে অসুস্থতার পর, জুন ১৯৯৯।

বসুবাড়ি

বড় পরিবার নামডাক খুব
কিন্তু কী বিচিত্র এক জগৎ
একদিকে বিপ্লবের রক্তিম ছবি
সীমাহীন ত্যাগ ও তিতিক্ষা,
অন্যদিকে আদর্শ ও ভাবের
মরুভূমি।
পঙ্কিল সংকল্প, মিথ্যা ও
স্বার্থপরতার ঐকতান
এটাই কি জগতের নিয়ম!

জুন ১৯৯৯

উত্তরাধিকার

আমাদের এই জীবন
পরিপূর্ণতার এক ছবি,
উত্তরাধিকার রক্ষার দায়
ছিল বড়ই কঠিন,
কিন্তু শেষ রক্ষা তো হল
সে এক কাহিনী।
পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে
এক যাত্রা, হাতে হাত
ধরে, ইতিহাস প্রতিষ্ঠায়,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রচারে
এবং সর্বোপরি দেশসেবার
বাণী সযত্নে রক্ষায়।
ভালবাসায়, নিষ্ঠায়, সেবায়
সমৃদ্ধ আমাদের এই জীবন।

আশি বছরের জন্মদিনে, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০০।